জনতা

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল

—পরিবেশক—

শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রথম সংস্করণ

মাঘ, ১৩৬৭ সাল।

তিন টাকা

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্তৃক প্রকাশিত এবং রূপবাণী প্রেস ৩১, বাদুড়বাগান
স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ হইতে শ্রীভোলানাথ হাজরা কর্তৃক মুদ্রিত।
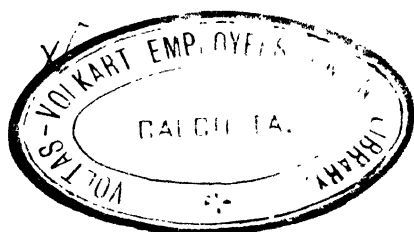
এক ॥ কাঁচের আওয়াজ ... ১
দুই ॥ কাম্য ... ১৭
তিন ॥ প্রথম অভিজ্ঞতা ... ৪১
চার ॥ কাব্যের ভূমিকা ... ৫৫
পাঁচ ॥ অসাধারণ ... ৬৯
ছয় ॥ ক্ষণপ্রভা ... ৮৬
সাত ॥ স্মরণীয় ... ১০২
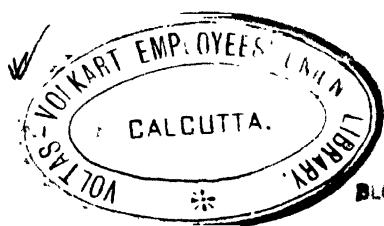
। এক ॥

'কুমীরের মত দাঁত বা'র করবেন না মশাই; আপনার হাঁ দেখ্‌লে ভয় করে। কলের পাইপটা সারিয়ে না দিলে বাড়ী-ভাড়া পাবেন না।' গিরীন বল্‌তে লাগলো,—'মাসকাবারি রক্ত চুষে খাওয়া এবার আপনার চলবে না—'

এই কথা বল্‌তে-বলতেই বাধলো বাড়ীওয়ালার সঙ্গে ঝগড়া। এবং প্রতিমাসের পয়লা তারিখে এমনি ঝগড়াই বেধে আসছে বহুকাল থেকে। হাতাহাতি হবার উপক্রম হতেই আর-সবাই এসে দু'জনকে জাপ্‌টে ধ'রে থামালো। তারপর পরস্পরের বিদীর্ণ কণ্ঠের আস্ফালন, এবং গালাগালি।

ভূদেববাবু ব'লে চললো, 'ঢের ভাড়া জুটে যাবে আমার, গোয়াল খোলা থাক্‌লে বৃষ্টির দিনে অনেক গরু এসে ঢুক্‌বে। আবার লম্বা-লম্বা কথা। জানিনে আপনার কেচ্ছা? মদ খেয়ে ঢলাঢলি,—মেয়েছেলে নিয়ে——ব'লে দেবো এদের, বড়বাজারের সেদিনের কাণ্ডটা? বস্তিবাটি থেকে সেবার পুলিশে ধ'রে এনেছিল কেন, বলে দেবো সকলের সাম্‌নে?'

গিরীনের চোখদুটো রাগে তখন ধক্‌ধক্ ক'রে জ্বল্‌ছে। নিজেকে ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করতে-করতে সে চীৎকার ক'রে বল্‌তে লাগলো, 'যদি না বলো তবে তোমায় এখুনি কুচিয়ে কেটে ফেল্‌বো···অনেক খুন করেছি আমি···ছেড়ে দাও তোমরা, ছেড়ে দাও বল্‌ছি। কি বল্‌বি বল্···আমি চোর, আমি চরিত্রহীন—এই ত? আর তুই? তুই যে নীচ, হীন, রক্তপিশাচ—'

কিন্তু কেউ তা'কে ছেড়ে দিল না। কেন ছেড়ে দিল না, এবং দিলেই বা কী ঘটনা ঘট্‌তো সে-আলোচনা নিষ্ফল।

লোকজন দাঁড়িয়ে গেছে। মাসে একবার ক'রে দাঁড়িয়ে যায়। যারা পথের ওপরের ফুট্‌পাথ দিয়ে দেখে-দেখে চ'লে যায়, তারাও জানে এ-বাড়ীতে মাঝে-মাঝে কেন লোকজন দাঁড়ায়। গিরীনের গলার আওয়াজ পাহারাওয়ালা পর্য্যন্ত জানে।

শেষকালে এক বৃদ্ধা এসে সেদিন থামালো দু'জনকে। একজন নাছোড়বান্দা জমিদার, আর-একজন দুর্দ্ধর্ষ প্রজা। বৃদ্ধা দু'জনের মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে মিটিয়ে দিয়ে বললে, 'গালাগালি ত করলে বাবা এতক্ষণ, এবার একটু গলাগলি করো দিকি? বুকের ছাতি বাবা তোমাদের দু'জনেরই বড় নয়।'

তা' বটে। গিরীন এতক্ষণ এটা বুঝতে পারেনি, কেমন করেই বা পারবে, বুঝতে সে জীবনে কিছুই পারলো না। ফস করে অত লোকের মাঝখানে গলা নামিয়ে বললে, 'এ-বাড়ীতে আপনারা কি নতুন এসেছেন বুড়ি-মা? বেশ, বেশ···ওহে ভূদেববাবু, কাল এসো, দেবো তোমার ভাড়াটা চুকিয়ে,—আরে, তোমরা সব দাঁড়িয়ে আছো কেন বলো ত? সঙ্‌ দেখ্‌ছ?'

একজন কে-যেন বল্‌লে, 'সঙ্‌ নয়, মাতাল।'

'তবে রে—' বলে দু'পা গিরীন এগোতেই সবাই যে-যার পালাতে লাগলো। দেখা গেল, তার মুখচোখের চেহারা দেখে বাড়ীওয়ালারো রাগ কতকটা প্রশমিত হয়েছে। হ্যাঁ, ভাড়াটা আগামী কাল অবশ্য সে পাবেই; গিরীনের চরিত্র-দোষ থাকুক, কিন্তু তার কথার ঠিক আছে। বাড়ীওয়ালা বিদায় নিল।

সবাই চলে যাবার পর বুড়ী বললে, 'দেখছিলুম তোমাদের কাণ্ডটা। রক্ত ত' সবারই গরম বাবা, ঠাণ্ডা রাখতে পারে ক'জন? তোমার বাছা অল্প বয়েস, ক্ষ্যামা-ঘেন্না ক'রে চললেই পারো।'

বুড়ীর কথাগুলি ভারি মিষ্টি, গিরীনের আর রাগ নেই। সে বললে, 'কোন্ ঘরে থাকা হয় বুড়ী-মা?'

'নীচের তলায় ওই পেছন দিকে দু'টো ঘর···ভাল বাড়ী ত আর খুঁজে বা'র করবার সময় ছিল না, এসে পড়তে পারলে হয়। হঠাৎ বিপদে পড়লে মানুষ,—আর অল্পদিনের জন্যে—'

কথায়-কথায় জানা গেল, কি যেন একটা কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে বুড়ীর জামাই এসে উঠেছে হাসপাতালে; মেয়ে সেই হাসপাতালে স্বামীর সেবা-শুশ্রূষা করতে গেছেন, একটা কেবিন্ ভাড়া করা হয়েছে। ছেলে-মেয়ে দু'টি আছে বুড়ির হেফাজাতে। অবস্থা, যতদূর জানা গেল, নিতান্ত মন্দ নয়। অসুখ সারলেই আবার তা'রা দেশে চলে যাবে। অল্পদিনের জন্যই আসা। আলাপ-আলোচনাদির পর গিরীন বলে' বসলো 'তোমার যদি দোকান-বাজার করবার দরকার থাকে, আমাকে ব'লো,—ভয় নেই বুড়ী-মা, হিসেব-টিসেব সব এসে আমি বুঝিয়ে দেবো।'

'না বাবা, আমাদের সঙ্গে একটা ঝি আছে।' এই ব'লে বুড়ী তখনকার মতো বিদায় নিল।

শেষ কথার আত্মীয়তাটুকু বুড়ী হয়ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতে পারলো না। বুড়ীর দোষ নেই, যে-আত্মপরিচয় গিরীন একটু আগে প্রকাশ করেছে, সেটা অত্যন্ত শ্রীহীন বর্ব্বরতা; মানুষ যদি তা'কে বিশ্বাস না করে তবে সে তাদের অপরাধ নয়। এ বাড়ীটা প্রকাণ্ড, অনেকগুলো মহল, চার-পাঁচটা প্রবেশ-পথ, কে-কোথায় খণ্ড-খণ্ড পরিবার নিয়ে ছড়িয়ে থাকে গিরীন কোনোদিন হিসাব করেও দেখেনি, সে গ্রাহ্যই করে না। সে করে না, কিন্তু আর-সবাই যে তা'র সম্বন্ধে সন্ত্রস্ত এও ত আর গোপন করা চলে না। তার যাতায়াতের পথে মুখোমুখি হলে সবাই সভয়ে সরে দাঁড়ায়, কলতলায় সে এসে দাঁড়ালে কি-মেয়ে কি-পুরুষ সন্ত্রাসে সেখান থেকে চলে যায়; তা'র যেদিকে

ঘর সেদিকে মশা-মাছি পর্য্যন্ত এগোয় না। পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার মধ্যেই মানুষ বাঁচে; গিরীনকে চিরদিন সবাই এড়িয়ে এসেছে। সে জানে না বটে কিন্তু তার সম্বন্ধে সকল সংবাদ এ-বাড়ীর সবাই রাখে।

নিজের ঘরে এসে গিরীন ঢুক্‌লো। এখনি তা'কে বেরোতে হবে। কোথায়, তা সে নিজেও জানে না। তার না-আছে কার-কারবার, না-আছে চাক্‌রি। তবু সে বেরোয়, প্রতিদিনই বেরোয়; এগারোটা থেকে সাড়ে এগারোটার মধ্যে না-বেরোলেই তার চলে না। রাত্রে সে যখন ফেরে এ-বাড়ীর সবাই তখন নিদ্রা যায়। পরিবার-পরিজন তার কেউ নেই, ছিল কিম্বা আছে এ-প্রশ্ন কেউ তাকে কোনোদিন করেওনি। সম্ভবত নেই। অবস্থা তার মন্দ নয়, বরং এ-বাড়ীর অনেকের চেয়েই ভাল, কিন্তু সে-অবস্থার নদীতে নিত্য জোয়ার-ভাঁটা—তা'তে ঐক্য নেই, সঙ্গতি নেই।

বাইরে পায়ের শব্দে পায়চারি থামিয়ে গিরীন দাঁড়ালো,—'কে? —আরে, বুড়ি-মা, এসো এসো—'

বুড়ী একখানি রেকাবে করে কতকগুলি আনারস কেটে এনেছে, তার পাশে দু'টি সন্দেশ, হাতে এক গেলাস জল বললে, 'খেয়ে নাও ত দাদা…আজ দ্বাদশী কিনা…বাঁউনের ছেলে—'

গিরীন হেসে বুড়ী-মার হাত থেকে সেগুলি নিল। বললে, 'আজ কী সুপ্রভাত, তোমার সঙ্গে দেখা,—এসব ত আর আমাকে কেউ দেয় না…বসো তুমি বুড়ি-মা, তোমার সামনেই ব'সে-ব'সে খাবো—' একখানি-একখানি আনারস মুখে দিয়ে চিবোতে-চিবোতে সে পুনরায় হেসে বললে, 'আমার মা'র কথা মনে পড়ছে,—বুঝলে বুড়ি-মা, দ্বাদশীতে আমি মুখের কাছে না দাঁড়ালে তিনিও জল খেতেন না—মা বড় মিষ্টি, না বুড়ি-মা?'

বুড়ী বললে, 'আহা, তা আর নয় ভাই, সব্বংসহা,—তবে আর মা বলেছে কেন? বলে—কুপুত্তুর যদ্যপি হয় কুমাতা কখনো নয়।'

তারপর একটু-একটু ক'রে বৃদ্ধার সঙ্গে আলাপ চলে। গিরীন-যে ভদ্রঘরের সন্তান, অবস্থা-যে একসময় তাদের বেশ ভালই ছিল, এ-কথা বৃদ্ধা স্পষ্ট করে জান্‌তে পারে। বছর দশ-বারোর ইতিহাস সে আর বুড়ী-মার কাছে প্রকাশ করলো না। বললে, 'লোককে বললে কি-আর এখন বিশ্বাস করবে, আমি লেখাপড়া জানি,—একটা পাশও করেছিলুম বুড়ি-মা,—কিন্তু সে-সব কথা আর মনে নেই··· কোথা দিয়ে যেন কী হয়ে গেল এই ক'টা বছর।'

এমন সময় একটি মেয়ে এসে বুড়ীর পাশে দাঁড়ালো। হাতে তার একটি ছোট পাথরের বাটি,—'এই নাও দিদ্‌মা, মুখশুদ্ধি আর পয়সা—'

'এইটি বুঝি তোমার নাৎনী বুড়ী-মা? ভারি ফুট্‌ফুটে মেয়েটি ত?'—হাসতে-হাসতে গিরীন একটু এগিয়ে এলো, তারপর চোখ পাকিয়ে হাতের থাবা দুটো তুলে ভয় দেখিয়ে বললে, 'হালুম্‌!'

মেয়েটি ভয়ে আঁৎকে উঠে দিদিমাকে আঁক্‌ড়ে ধরলো, হাত থেকে তার একটা দু'আনি মেঝের উপর ছিট্‌কে পড়লো।

নিজের বন্য রসিকতায় গিরীন নিজেই হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তার সঙ্গে একটু হেসে দু'আনিটি কুড়িয়ে নিয়ে বৃদ্ধা বললে, 'এই নাও ভাই, এই তোমার দক্ষিণে···অম্‌নি ত খাওয়াতে নেই বাঁউনের ছেলেকে—

গিরীন একটু প্রতিবাদ ক'রে বললে, 'সে কি বুড়ি-মা, পৈতে আছে বলেই বুঝি আমি বামুন;···না, না—'

'সে কি হয় ভাই, এ-যে নিয়ম···আমরা অপরাধী হবো?'

অগত্যা দু'আনা পয়সা ব্রাহ্মণের প্রণামী-বাবদ গিরীনকে গ্রহণ করতে হ'লো। বৃদ্ধার আর বসবার সময় ছিল না, রান্নাবান্না বাকি, উঠে যাবার সময় বললে, 'আচ্ছা দাদা, আলাপ-সালাপ হ'লো—আর

এই ত নীচেই রইলুম···ও ভাই কমু, পেন্নাম কর্ বাছা, বাঁউনের ছেলে, গলায় আঁচল দিয়ে পেন্নাম কর্—'

মেয়েটি এতক্ষণে একটু সাহস পেয়েছিল, অর্থাৎ, এই জংলী লোকটা যে সত্যই ব্যাঘ্র নয় এ-কথাটি সে অনুভব করেছে। দিদিমার কথায় গলায় আঁচল দিয়ে মেঝেয় নুইয়ে প'ড়ে সে গিরীনকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়ালো। গিরীন বারণ করলো না, অস্বীকার করলো না, এমন কি দু'পা পিছিয়ে যাবার চেষ্টাও তার দেখা গেল না।

দরজার বাইরে যেতেই গিরীনের মাথায় আবার পাগ্লামি চেপে বসলো। হঠাৎ গিয়ে হেসে পুনরায় সে কমুর দিকে ঝুঁকে প'ড়ে বলে' উঠ্লো,—'হালুম্!'

কমু ফিরে দাঁড়ালো, একটুখানি পরিচ্ছন্ন ও স্নিগ্ধ হাসি হেসে বললে, 'ইঃ, এবারে আর ভয় খাবো না, তুমি বাঘ না আরো কিছু।'

দিদিমার গলা ধরাধরি ক'রে কমু নীচে নেমে গেল।

বেশ লাগছে দিনটি—গিরীন বেশ খুসি আছে। খুসি সে রোজই থাকে, কিন্তু আজকের সঙ্গে মিল নেই প্রতিদিনের। তার জাতি ছিল না, ভুলেই গিয়েছিল সে কোন্ জাতি। আজ একজন এসে স্বীকার করেছে সে ব্রাহ্মণ, তাকে দক্ষিণা দিয়ে আশীর্ব্বাদ নিয়ে যেতে হয়। আজ বারো বছরের মধ্যে কোথাও মনে পড়ে না যে, কোনো একদিন কোনো রকমে তার ব্রাহ্মণত্ব প্রকাশ পেয়েছে। পৈতাটা ভাগ্যি সে রেখেছিল!

কিন্তু প্রণামটা?—জীবনে কেউ তা'কে কোনোদিন প্রণাম করেনি। শরীরের নানা জায়গায় তা'র আছে ক্ষতের দাগ, একটা আঙুল তা'র কাটা, একটা পায়ে একটু খুঁড়িয়ে চলে,—দেহের এই সমস্ত ক্ষত ও ক্ষতির ছোট-ছোট ইতিহাস তার অন্তরে জমা আছে, সে-ইতিহাস কেবল কলঙ্ক ও লজ্জার,—তাদের ছাপিয়ে এলো আজ এই প্রণাম;

একটি নিষ্পাপ, কলুষলেশহীন কুমারীর প্রণাম। তবে সে নিতান্ত অযোগ্য নয়!

সারা দুপুরটা গায়ে পথের হওয়া লাগিয়ে বিকালে সে বাড়ী ঢুক্‌লো। ঢুকেই সিঁড়িতে উঠ্‌তে আবার কমুর সঙ্গে দেখা। ওদিকে ঝি কাজ করছে। বুড়ী-মা খাইয়ে দিচ্ছেন কমুর ছোট ভাইটিকে। কমু তাকে দেখে বললে, 'একবার হালুম্‌ ব'লো?'

'হালুম্‌।' ব'লে গিরীন তেড়ে গেল। কিন্তু কমু আর ভয় পায় না, হাতালি দিয়ে নেচে উঠলো। বললে, 'তুমি ফুঁ দিয়ে তুলোর পাখী ওড়াতে পারো?'

গিরীন বললে, 'হ্যাঁ, পারি।'

'কই ওড়াও দিকি?'—ব'লে ঘরে গিয়ে কোথা থেকে কমু একটু তুলো নিয়ে এলো। বললে, 'একটা আমি, একটা তুমি—মাটিতে যার আগে পড়বে সেই হারবে কিন্তু।'

'বেশ, তাই সই।' ব'লে গিরীন প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালো।

দুই চিম্‌টি হাল্‌কা শিমুল তুলো হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়ে দু'জনে তলার দিক থেকে প্রাণপণে ফুৎকার দিতে লাগলো; সে কী উৎসাহ। নাৎনীর এই বাচালতায় দিদিমা তিরস্কার করতে লাগলেন, কিন্তু তখন কে-কা'র কথা শোনে। ছেলেটা খাওয়া ফেলে ছুটে এলো। কমুর তুলো শূন্যেই ভাসছে, গিরীনের তুলোটুকু বোধহয় একটু ভারি, কেবলই নেমে পড়ছে। অবশেষে মেঝের কাছাকাছি আসতেই গিরীন দিক্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মেঝের উপর উপুড় হয়ে পড়ে ফুঁ দেবার চেষ্টা করলো। কিন্তু কিছুতেই না, তুলো পড়লো মাটিতে, তারই হ'লো হার। সর্বাঙ্গ তখন তার ঘর্ম্মাক্ত, মুখ-চোখ রাঙা। কুমু বিজয়োল্লাসে হৈ চৈ ক'রে হেসে বললে, 'কেমন হয়েচে, বললুম পারবে না আমার সঙ্গে? হেরেছ ত? কানমলা খাও এবার?'

গিরীন নিজের হাতেই নিজের দু' কান মলে' বললে, 'আর কি?'

'নাকখৎ দাও মেঝের ওপর ?'

কথাটা শুনেই দিদিমার চোখ পড়লো এদিকে। হাঁক পেড়ে বললেন, 'বলি হ্যালা কমু, তোর কাণ্ডটা কি ? বাছাকে এমন ক'রে হয়রাণি করা···ও কি তোর একবয়েসী—?'

'বাড়ী রেখে আমার সঙ্গে খেল্‌তে আসে কেন দিদ্‌মা, আমি নাকি ডাকতে গেছলুম ?'

রোয়াকের ধারে গিরীন বসে পড়লো ; তখনো সে হাঁপাচ্ছে। কমু এসে বসলো তার কাছে, যেন কতদিনের বন্ধুত্ব—কতকালের পরিচয়। কমুর কানে দু'টি দুল, হাতে কয়েকগাছি নূতন ফ্যাসানের সোনার চুড়ি। কমু দেখতে সুন্দর, আর একটু বড় হলে আরো সুন্দর হবে। জ্ঞান এবং অজ্ঞানের সন্ধিস্থানে সে পা দিয়েছে। জীবনে যার বারে বারে নৈতিক অধঃপতন ঘটেছে, কমুর কাছে বসতে তার বড় সঙ্কোচ হয়।

কত গল্পই চল্‌তে লাগলো। কবে কোন্ গ্রামের ধারে একটি জম্বী গাছের তলায় একটা ছাতার্ পাখী মরে পড়েছিল তারই রোমাঞ্চকর ইতিহাস। পাঠশালার পণ্ডিত কোন্ এক বর্ষাকালে কেমন পা পিছলে পড়ে' গিয়েছিলেন, আর সেই-যে ডালিম-বৌ একদিন ভূতের ভয় পেয়ে কাঠের সিন্ধুকের মধ্যে ঢুকেছিল, সে-কথা কি কেউ ভুলে গেছে ?

গিরীন বললে, 'দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের বাগানে একবার তাকে একটা মাকড়সা তাড়া করেছিল, সে তখন খুব ছোট। সেই সময়টায় সে একদা ধরেছিল একটা কোকিলের ছানা, কমুর মতো তার ঠোঁটের ভিতরটি ছিল লাল, মরে গেল সেই পাখীটা একদিন ; রাঙা পিঁপ্‌ড়ে তার চোখ খুব্‌লে খেতে লাগলো।

যাতায়াতের পথের পাশে তাদের গল্প চল্‌ছিল, দু'জনেই চলেছে ভেসে ভেসে। লোকনাথ তাদের দিকে একবার কটাক্ষে তাকিয়ে

পার হয়ে গেল, পার হয়ে গেল ও-ঘরের ন'-বৌ। তাদের চোখে-মুখে আশঙ্কার ছায়া,—এই কুপরিচিত দুঃশীল ও বিপজ্জনক লোকটা মেয়েটিকে না বিপদে ফেল্‌লে হয়। কমুর গায়ে অতগুলি সোনা-দানা, তাছাড়া সম্ভ্রান্ত ঘরের কুমারী মেয়ে...ও-লোকটার ত আর ধর্ম্মজ্ঞান নেই,—ভগবান জানেন, কী মৎলব আছে ওর মনে-মনে।

'তুমি সাবানের ফেনা দিয়ে রঙীন ফানুস ওড়াতে পারো?'

'পারি না? তাসের ঘরও তৈরি করতে পারি। কতবার করেছি।' গিরীন বল্‌লে।

'আর কাপড়ের ইঁদুর?—দেখ্‌বে একটা মজা...চোর আসবে কেমন?'—ব'লে কমু নিজের দুই হাতের আঙুল ক'টি পাকিয়ে এক অদ্ভুত উপায়ে ধরে বল্‌তে লাগলো, 'এই ছাখো, বর আর বউ ঘুমিয়ে রয়েচে ঘরে, দরজায় খিল বন্ধ; তিনটে চোর নীচের তলায় ফন্দি আঁট্‌চে, চুরি করবে। কুকুরটা ডাক্‌চে ঘেউ-ঘেউ ক'রে—দেখলে ত?'

গিরীন বল্‌লে, 'আমিও পারি, দেখ্‌বে? এই ছাখো—খরগোস ছুট্‌চে জঙ্গলে, ব্যাধ তাড়া করেছে; তীরে এসে বিঁধ্‌লো খরগোসের বুকে; মরে গেল সে।'

কমু আর-একটু কাছে এগিয়ে এলো। বল্‌লে, 'আমাকে শিখিয়ে দেবে? তুমি ত অনেক জানো।'

হ্যাঁ, অনেক জানে সে; অনেক দেখেছে সে জীবনে। কিন্তু কিছু যে জানেনা তাকে কিছু শেখানো কঠিন। দু'জনের মধ্যে যে তফাৎ অনেকখানি। একজন কুঁড়ি থেকে ফুল হয়ে ফুট্‌ছে, আর-একজন ফল হয়ে ঝরে পড়েছে; পোকায় খেয়েছে তার শাঁস, তার প্রাণের ঐশ্বর্য্য, জীবনটা তার খরচ হয়ে গেছে। গিরীন চোখ তুলে তাকালো তার দিকে। সুন্দর দুটি চোখ; সে-চোখে এখনো ছায়া পড়েনি পৃথিবীর মালিন্যের, এখনো ত'াতে রয়েছে আকাশের মায়া।

ধীরে-ধীরে সে উঠে দাঁড়ালো। বল্‌লে, 'শেখাবো আর-এক সময়, বুঝলে কমু? এখন যাই।'

ভারাক্রান্ত মন, অবসাদগ্রস্ত দেহ—গিরীন চলে গেল আপন ঘরের দিকে।

সন্ধ্যার পরে কমুর মা ফিরে এলেন, তাঁর চোখে-মুখে একটু আশ্বাসের চিহ্ন। কমুর বাবা হাসপাতালে একটু ভাল আছেন। সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠ্‌তে এখনো ক'দিন সময় লাগবে। মা এসে সারাদিনের কথালাপ সুরু কর্‌লেন দিদিমার সঙ্গে। ছোট ভাইটি তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

কমু এক ফাঁকে বেরিয়ে এলো। ভাল লাগচে না তার ঘরের মধ্যে। কেমন ক'রে লাগবে? একদিকে তার জয়ের আনন্দ, আত্মপ্রসাদ, অন্যদিকে কৃতিত্ব আহরণের প্রবল তৃষ্ণা! গিরীনের কাছে তার না গেলেই চল্‌ছে না! সমস্ত ম্যাজিকগুলো তার শিখে নেওয়া চাই-ই; দেশে গিয়ে মন্টু আর শৈলকে সে চম্‌কে দেবে, বল্‌বে না সে কেমন ক'রে শিখেছে, জানাবেনা সে কাউকে তার এই যাদুবিদ্যা শেখার গোপন ইতিহাস।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলো দোতলায়। চাটুয্যে মশাইয়ের ঘরের কাছে ঘেঁষে যাবার সময় বড়দিদি বললেন, 'অ কমু, ওদিকে কোথায় যাচ্ছ মা? এত রাতে—'

'ম্যাজিক্ শিখ্‌তে যাচ্ছি পিসিমা।'

'ছি মা, যেতে নেই ওদিকে, ফিরে এসো; ওদিকে বাঘ আছে, জানো ত?'

স্নেহের সম্পর্ক সকলের সঙ্গে হয়ে গেছে। অনুকূল প্রকৃতি হলে সম্পর্ক তৈরি হতে একদিন সময়ও লাগে না। কিন্তু বারণ শুন্‌লো না কমু কারো, গেল সে গিরীনের ঘরের দিকে। সমস্ত বাড়ীটার সঙ্গে এদিকটা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন, অটল নীরবতা বুক চেপে বসেছে।

বারান্দায় আলো নেই, আলোর চিহ্নও নেই এদিকে। কমু গিয়ে ঘরের কাছে দাঁড়ালো। দরজার একটা কপাট বন্ধ; কৌতুক ক'রে কমু দিল দরজায় একটা টোক্কা; ভিতর থেকে রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে জবাব এলো, 'কে অ?'

আবার পড়লো এক টোক্কা। হাসি চাপতে গিয়ে কমুর পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি বুঝি পাকিয়ে যায়। ভিতর থেকে গিরীন ধমক দিল, 'ইয়ার্কি করিসনে আবদুল্, ভেতরে আয়—' গলার আওয়াজটা তা'র একটু জড়ানো।

তবু এলো না দেখে গিরীনের একটু সন্দেহ হলো। ঘরে আলো জ্বল্‌ছে, উঠে সে দরজার কাছে আসতেই কমু আর সাম্‌লাতে পারলো না; বাঁশীর মতো ধারালো তার তীব্র দীর্ঘ কণ্ঠে হেসে উঠলো। হেসে উঠেই ধরলো গিরীনের একটা হাত চেপে। বল্‌লে, 'কেমন জব্দ? টের পেয়েছিলে একটুও? কতক্ষণ এসে দাঁড়িয়েছি আচ্ছা, আবদুল্ কে বলো না?'

'আবদুল্? সে একটা লোক, দোকানে বসে বিড়ি পাকায়। তুমি এলে এত রাতে ম্যাজিক্ শিখতে?'

'বেশ করেছি, খুব করেছি। ওমা, কতগুলো লাঠি তোমার ঘরে; লোকের মাথায় মারো বুঝি?—গেলাসে ক'রে কী খাচ্ছিলে তুমি? —এ রাম্!'

গেলাসটা রাখলো গিরীন তক্তার উপর। বল্‌লে, 'আচ্ছা, আর খাবো না, তুমি এসেছ যখন—'

কমু বল্‌লে, 'কী ওতে?'

'ওতে?'—হেসে গিরীন একটা ঢোক গিল্‌লো, বল্‌লে 'ওতে জল।'

'জল বুঝি রাঙা হয়? কী মিথ্যুক।'

হাতটা তা'র ছেড়ে দিয়ে কমু ঘরের চারিদিকে তাকালো— জান্‌লাগুলো সব বন্ধ। অত্যন্ত অস্বাভাবিক কতকগুলো গৃহ-সজ্জা,

একটার পাশে আর একটা থাকার কোনো যুক্তি নেই, সামঞ্জস্য নেই। ভিতরটায় খানিকক্ষণ থাক্‌লে আতঙ্ক হয়। ঘরে আলো সামান্য, কিন্তু সেই আলোতেই কমুর গায়ের গহনাগুলি ঝলমল করছে। গিরীন তা'র প্রতি একবার একান্ত দৃষ্টিতে তাকালো। গহনাগুলি বাজারে বিক্রি করলে তার অন্তত ছ'মাস বেশ চলে যেতে পারে; বাজারে তার অনেক দেনা—হ্যাঁ, একটি সামান্য কাজ, তার পক্ষে অত্যন্ত সহজ একটি কাজ এখুনি ক'রে ফেল্‌তে পারলে বহু মহাজনের লাঞ্ছনার হাত থেকে সে মুক্তি পায়।

'আচ্ছা, কমু?'

কমু তার দিকে তাকিয়েই ছিল এতক্ষণ, সে বুঝতে পারেনি। বন্য জানোয়ারের হিংস্র দৃষ্টিকেই সে চেনে, সে বুঝতে পারে না ভয়চকিতা হরিণীর চোখের মায়া। কমু বল্‌লে, 'ও মা, তোমার চোখ পিট্‌ পিট্‌ করছে কেন?'

একটু থতিয়ে সে বল্‌লে, 'আচ্ছা কমু, তোমার পুরো নাম কি?'

'পুরো নাম?—কমলিকা মিত্র। গাঁয়ে আমাকে সবাই খুকি বলে ডাকে। ইস্‌, কি বিচ্ছিরি গন্ধ তোমার ঘরে, ভারি নোংরা কিন্তু তুমি।'

'আমি নোংরা—বাঃ, বেশ ত—আর তুমি বুঝি খুব পরিষ্কার?'

'ওমা, পরিষ্কার না? দেখ দিকি?'—নিজের প্রতি গিরীনের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে কমু বল্‌লে, 'একটুও ধূলো-কাদা নেই। তুমি ত একটা ভূত!'—ধমক দিয়েই সে হাসতে লাগলো। খুসী হলো সে গিরীনের উপর; গিরীন প্রতিবাদ করছে না। গিরীন তা'র করতলগত।

'আচ্ছা, কা'র গায়ের জোর বেশি, বল ত কমু?'

তা'র আজগুবি প্রশ্নে কমলিকা উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলো। হাসতে-হাসতে সে লুটিয়ে পড়লো তক্তার একটা ধারে। তার হাসির শব্দে আছে একটি প্রচ্ছন্ন শক্তি—পাথরে চিড় খায়—মাটি ওঠে কেঁপে—রাত্রি হয় চঞ্চল—ঘর ওঠে দুলে। তার হাসির শব্দই আলাদা।

'আমাকে আজ ম্যাজিক্ না শেখালে ছাড়বো না কিন্তু।'

গিরীন তখন একটু-একটু টল্‌ছে। বল্‌লে, 'মুখের ম্যাজিক্ দেখবে কমু?'

'সে আবার কি?'

'দাঁড়াও দেখাচ্ছি।' গিরীন বল্‌লে, 'শোনো—এই দাঁত দেখ্‌ছ ত? কথা বেরোবে এর পাশ দিয়ে।'

কমু হেসে বল্‌লে, 'সে ত সবারই বেরোয়।'

'আমার বেরোবে নতুন কথা। ওয়ান্, টু, থ্রি—আমি কি বিশ্রী।'

'তারপর?'

'ফোর্—আমি একটা চোর!'

কমু হাততালি দিয়ে আবার হেসে উঠলো। বল্‌লে 'আচ্ছা, তুমি লাঠি খেল্‌তে জানো? ওরে বাপরে, আমাদের গাঁয়ের ঝণ্টু-পালোয়ান কী লাঠি খেলে। একবার একটা বাঘ মেরেছিল সে।'

'আমিও জানি লাঠি খেলতে। বাঘ মারতে আমিও—'

'ইস্, তার মতন আর খেল্‌তে হয় না।'

কথাটা গিরীনের পৌরুষে ভয়ানক আঘাত করলো। বললে, 'দেখ্‌বে?' বলেই সে একখানা লাঠি টেনে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো—বল্‌লে, ওই কোণে দাঁড়িয়ে ছাখো। তোমার ঝণ্টু-পালোয়ানকে হারিয়ে দেবো, তবে আমার নাম গিরীন গোঁসাই।'—ঈর্ষায় ধক্‌ধক্ ক'রে জ্বল্‌ছে তা'র চোখ। এই বালিকার কাছে তার আত্মসম্মান আজ বিপিন্ন।

কোণে গিয়েই দাঁড়ালো কমলিকা। গিরীন লাঠিটা বাগিয়ে ঘোরাতে লাগলো। দু'বার না ঘোরাতেই হলো এক কাণ্ড। তক্তার উপরে ছিল গেলাসটা, লাঠির ঘা লেগে বেঝের উপর সেটা ছিট্‌কে পড়ে সশব্দে চুরমার হয়ে গেল। চমক ভাঙলো তার এতক্ষণে—লাঠি নামালো। কিন্তু গেলাস ভাঙার সেই শব্দটা ঠিক কমলিকার হাসির

মতো। হাসির মতো সেটা চুরমার হলো। ভাঙা কাঁচের গেলাসের টুক্‌রোগুলির মধ্যে খুঁজে পেয়েছে সে কমলিকার হাসির অনুরূপ চূর্ণ-বিচূর্ণ আওয়াজ। প্রাণ দিয়ে শুন্‌লো সেই শব্দটি—হৃদয়ের পদ্মপুটে ঢেকে রাখলো শব্দের সেই অনির্ব্বচনীয় ব্যঞ্জনাটি।

গেলাসের ভিতরকার দুর্গন্ধময় তরল পদার্থটুকু মেঝের উপর গড়াতে লাগলো। কমলিকা হাসবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু সেই মুহূর্ত্তেই ঘরে ঢুক্‌লো আর একজন। গিরীন উঠ্‌লো শিউরে। নেশা গেল তার ছুটে—বল্‌লে, 'বেরিয়ে যা আবদুল্‌, এখন যা ভাই;—যা এ-ঘর থেকে।

আবদুল্‌ গেল না—কুৎসিত দৃষ্টিতে কমুর দিকে একবার তাকিয়ে হেসে সে জিজ্ঞাসা করলো, 'কোত্থেকে আন্‌লি রে একে?—বাঃ!'

গিরীন চীৎকার ক'রে উঠ্‌লো 'অপমান করিসনে ভদ্দলোকের মেয়েকে—বেরিয়ে যা বল্‌ছি। যাবিনে—?' বলেই সে কুলুঙ্গী থেকে বা'র করলো একখানা ছোরা—স্তিমিত আলোয় তার ফলাটা ঝল্‌সে উঠ্‌লো। খুন করতে যাওয়াটা তার অভ্যাস।

'শালা, মনে রাখিস্‌, আমি ইব্রাহিমের ছেলে।'—বলেই আবদুল্‌ গেল পালিয়ে। প্রতিজ্ঞা ক'রে গেল, ওই ছোরা একদিন সে পিছন থেকে বসাবে গিরীনের পিঠে।

গোলমাল একটা হোলো, বাড়ীর অনেকেই এলো ছুটে। দিদিমা এলেন, এলো লোকনাথ, চাটুয্যে মশাই এসে কমুর হাতখানা ধরে টেনে তাড়াতাড়ি বাইরে নিয়ে গেলেন। হৈ-চৈ হ'তে লাগলো। একজন ছুটলো থানায় খবর দিতে। হতভাগা এবারে হাতে-নাতে ধরা পড়েছে। এবারে সবাই পেয়েছে সুবিধা। দাগী আসামী তিলে তিলে করে পাপ, সময় হ'লে ফলে।

অন্যায় কাজ সে কিছুই করেনি; জানে, শাস্তি তার হবেনা। পুলিশের কাণ্ড-কারখানায় সে আর ভয় পায়না। গিরীন বসে রইলো

চুপ করে ; এত লোকের অভিযোগের বিরুদ্ধে একটিও সে প্রতিবাদ করলো না। সবাই একে-একে চলে যাবার পর হাত বুলিয়ে বুলিয়ে সে কাঁচের টুক্‌রোগুলি একত্র করতে লাগলো। এক জায়গায় সেগুলি একত্র ক'রে একটি-একটি হাতে নিয়ে সে আবার মেঝের উপর বাজাবার চেষ্টা করলো ; শব্দ হ'তে লাগলো ঠঁন্-ঠুন্ ক'রে। কান পেতে রইলো সে কাঁচগুলির আওয়াজের প্রতি। কাঁচ ভাঙার মতো হাসি।

অনেক রাতে পুলিশ এলো তাকে গ্রেপ্তার করতে।

দু' বছর বাদে সে জেল্ থেকে ছাড়া পেলো।

মতি-গতি তার বদ্‌লায়নি। একজন মার্কামারা ভবঘুরে, বেকার, দাগী আসামী—নগরীর পথে-পথে তা'কে ঘুর্‌তে দেখা যায়। অনেক বন্ধু তার চারিদিকে—অনেক সঙ্গী। তবু মাঝে-মাঝে ফাঁক পেলেই সে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে। রাস্তায়-রাস্তায় ট্রাম চলে—বাস্ চলে—তাদের ঘণ্টার আওয়াজ তার কানে আসে। দম্‌কল ছোটে, তার ঘণ্টার সঙ্গে গিরীনের মন উধাও হয়ে যায়। দোকানের ধারে গিয়ে দাঁড়ায়—টাকা-পয়সার শব্দ হয়। চাবি-সারানোওয়ালা বড় একটা তাদের আংটায় একগোছা চাবি বেঁধে ঝণাৎ-ঝণাৎ শব্দ ক'রে চলে যায়। গিরীন কিছুদূরটায় যায় তা'র সঙ্গে-সঙ্গে। খঞ্জনী বজিয়ে ভিখারী গান গাইলেই সে থম্‌কে দাঁড়িয়ে শোনে। শোনে সে কান পেতে, আর ভাবতে চেষ্টা করে এই শব্দের মধ্যে তার অতীত জীবনের কোন স্মৃতি জড়িত কিনা।

নদীর ধারে গিয়ে দাঁড়ায়, ষ্টীমারের বাঁশী বাজে। কুলুকুলু গঙ্গা বয়ে যায়, গিরীন চেয়ে থাকে সেইদিকে। চেয়ে থাকে উদাস হয়ে।

অবশেষে একদিন খুনের দায়ে সে আবার ধরা পড়লো। বিচারে হলো তা'র যাবজ্জীবন দ্বীপান্তের। হাতে-পায়ে লোহার শিকল দিয়ে যখন তাকে কারাগারে পাঠানো হচ্ছে, লোহার শিকলের ঝুম্‌ঝুম্

আওয়াজটি শুন্‌ছে সে কান পেতে, এও প্রায় সেই ভাঙা কাঁচের টুক্‌রোর মতো আওয়াজ। জীবনে একটি দিন মাত্র চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছিল কাঁচের গেলাস—আলো এসে পড়েছিল তার অন্ধকূপে—দেখা পেয়েছিল সুন্দরের!

জেল্‌এর পাখী এসে পৌঁছলো জেল্‌এ—তখন খাবার ঘণ্টা বাজ্‌ছে।

॥ দুই ॥

অসাধারণ এতটুকু নয়।

অর্থাৎ সামান্য বেতনের একটি কেরাণীর ঔরসে, রুগ্ন বিকল এক কৃশাঙ্গিনীর গর্ভে, নিকৃষ্ট জীর্ণ একখানি ঘরের অস্বাস্থ্যকর অন্ধকারে; এবং দারিদ্র্যের বীভৎস নগ্নতার মধ্যে,—নিরানব্বই জন বাঙালী যেমন ক'রে জন্মায়!

না পেল আদর, না যত্ন। কেঁদে-ককিয়ে এক পল্‌তে দুধ, দিনের পর দিন সর্দ্দি-কাশিতে ভুগে হয়ত একটি জামা, নিতান্ত সঙ্গীন রোগে হয়ত বা এক পান্ ওষুধ। অযথা প্রহার এবং অকারণ গালাগাল আশ্রয় ক'রে, আত্মীয় স্বজনের নির্ম্মম অনাদর এবং সকরুণ উপেক্ষা পাথেয় নিয়ে নিতান্ত খাপ্‌ছাড়া ভাবেই বড় হ'ল।

লেখাপড়া?—সে এক তামাসার ইতিহাস। দুবেলা ঘরে যেন ডাকাত পড়াপড়ি। পাড়ার লোক জ'মে যেত। জোর ক'রে পড়া মুখস্থ করাবার নামে গোঁয়ার কেরাণী বাপের সে কি প্রচণ্ড তাড়না। আপিসে লোকটার নিত্য লাঞ্ছনার প্রতিক্রিয়া সেই পাঁচ বছরের ছোট শিশুটিকে মুখবুজে সহ্য করতে হতো। চোখের জল ফেলবার হুকুম ছিল না!

রুষ্টা সরস্বতী সেবায় অসন্তুষ্ট হ'য়ে তার সর্ব্বাঙ্গে ক্ষতচিহ্ন এঁকে দিয়েছেন। আজও সে চিহ্নগুলি মিলোয়নি।

সমবয়সীদের কাছে বন্ধুত্ব করতে গিয়ে পেয়েছে নিদারুণ অবহেলা, সরলতার বিনিময়ে পেয়েছে দয়াহীন বিদ্রূপ, উপকারের বদলে অকারণ অপমান এবং ঔদাসীন্যের পরিবর্ত্তে নিষ্ঠুর অপবাদ। পরের

কাছে গম্ভীর উপদেশ এবং বিশ্বাসীদের কাছে বিশ্বাসঘাতকতায় অভ্যস্থ হ'য়ে কোনো-রকমে অর্থহীন জীবনটি টেনে টেনে বেড়াচ্ছে।

ইহকালের স্বর্গ ধর্ম্ম এবং পরমং তপ পিতৃদেবতা অত্যন্ত সুসময়ে দেহরক্ষা করলেন অর্থাৎ দেউলিয়া হবার ঠিক পূর্বাহ্নে। কিন্তু তাঁর জীবনের সমস্ত দুষ্কৃতি চাপিয়ে গেলেন এর ঘাড়ে। রুগ্না মুমুর্ষু স্ত্রী, অনূঢ়া কন্যা ও চিরস্থায়ী দারিদ্র্য!

অবিবাহিত বয়স্থা ভগ্নিটি হঠাৎ কে জানে একদিন কেমন ক'রে নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে। আজও তার সন্ধান মেলেনি। কোথায় গেছে, কেন গেছে, তা শুধু সেই জানে!

সেই থেকেই জীবন ব'য়ে চলেছে। মানুষের স্বাভাবিক উচ্চাশাগুলি সংসারের ঘাত প্রতিঘাতের পথে চল্‌তে চল্‌তে কেটে-ছেঁটে একেবারে নির্মূল ক'রে দিতে হয়েছে। তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতম হ'য়ে যাওয়াটাই যেন সেই জীবনের পরম পরিণতি। চরম নগণ্যতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে গিয়ে মধুর মিথ্যা স্বপ্নগুলিকেও পথের ধূলার মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছে। সচ্চরিত্রই বলতে হবে বৈ কি। আঘাত করলে কাপুরুষের মত শুধু মৃদু হাসে, আকণ্ঠ বেদনায় ছাপিয়ে উঠলে চোখ মুখ বুজে ব'সে থাকে, উপবাস-ক্লিষ্ট মনে বিধাতার বিরুদ্ধে গ্লানি জ'মে ওঠে না,—এ কি কম কথা!

লোকের পাল্লায় প'ড়ে চটকলের কাজে ধর্ম্মঘট করলে বটে কিন্তু পুনরায় আর বাহাল হ'তে হ'ল না। সে অনেক কথা। পরে কিছুদিন ডাকঘরের পিওনগিরি করে। হঠাৎ কৌতূহলবশে একদিন সেখানকার একটি অভিজাত বংশীয়া মহিলার একখানি পত্র খুলে পড়তে গিয়ে কি রকম ভাবে না জানি ধরা পড়ে। ফলে চাকরি যায়। তারপর দিনকয়েক রেলওয়েতে কুলি সর্দ্দারের একটা কাজ পায়। কাজটা বেশ মনোমত। কিন্তু একদা গভীর রাত্রির অন্ধকারে একখানা ট্রেন ছুটে চলতে চলতে কেমন ক'রে লাইন থেকে ছিট্‌কে খাদে গিয়ে

পড়ে। অনেক যাত্রী মারা যায়। ধর পাকড়ের সঙ্গে সেও বাদ গেল না। একমাস সশ্রম কারাদণ্ডের পর সে যখন বেরিয়ে এল তখন তাকে যেন আর চেনাই যায় না।

অপমানের সঙ্গে দুর্বোধ্য একটা ব্যধিতে মাটির দিকে মাথাটা নুয়ে পড়েছে। কপালে পাটের পর পাট; চোখের কোণে কালি। অবসাদ আর অসহায়তা মুখের রেখায় রেখায় দাগ কেটে বসেছে। না আছে কোনো উদ্বেগ, না চঞ্চলতা। নিজেকে নিয়ে কি করবে, কোন্ পথে চল্‌বে—এ চিন্তা ধূলিসাৎ হ'য়ে গেছে; কেমন ক'রে বাঁচবে—এই হ'য়েছে সব চেয়ে বড় কাম্য।

অথচ বেঁচে থাকাটাই হচ্ছে সেই জীবনের পক্ষে সব চেয়ে কষ্টকর। একটানা সেই একঘেয়ে পুরাতন জীবন নিয়ে বেঁচে থাকা মানে যেন মরণের সুদীর্ঘ প্রতীক্ষা!

বিবাহের ইতিহাস বড় করুণ। সে এক কোন্ গাঁয়ের পথে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা। যজমানি ব্রাহ্মণটি ছিল একঘরে। অতি কৌশলে তাকে নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়ে একদিন রাত্রে ব্রাহ্মণ তাঁর সুন্দরী কন্যার সঙ্গে তার মালা বদল করিয়ে দেন্। অচেনা অজানা দুটি নরনারীর মধ্যে কোনো সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া সম্ভব হলো না। মেয়েটিও তার এই নিরীহ গোবেচারি স্বামীটিকে সহ্য করতে পারে নি। অত্যন্ত রূঢ়ভাবে একদিন বললে—তুমি দূর হবে ত হও, নৈলে আমি গলায় দড়ি দিয়ে তোমাকে ফাঁসাবো।

ফলে সেইদিনই সে নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়।

সত্যি সত্যিই নিরুদ্দেশ! না খোঁজ না খবর,—কিছুই না। এই জন-জটিলতার ভেতর থেকে তার নিজের খেইটাই শুধু যেন হারিয়ে গেছে।

মরণ-পথ-যাত্রী পক্ষাঘাতগ্রস্ত মা পুত্রের পথের দিকে চেয়ে রইল।

দেখা হ'য়ে গেল, না দীনদা? সাত আট বছরের কম কখনই নয়। কি বল?

নিতান্ত ছেলেমানুষের মত দীনু বললে—ঠিক হয়েছে! তোমার গলা শুনেই তখন আমার ঘুম ভেঙে গিয়েছিল মাধবী! এবার মনে পড়েছে।

স্বামীটি ভারি ভদ্রলোক। একটু ভারিক্কে বয়স হয়েছে, এই যা। হেসে আদর ক'রে পাশে বসালেন।

বললেন—বড় আনন্দের কথা, মাধবী যদি দাদা বলে আপনাকে তবে আমার আনন্দই ত সব চেয়ে বেশি!

পাঁচ বছরের ফুটফুটে মেয়েটি এবার জেগে উঠে বসলো। দীনু বল্‌লে—চিনতে পেরেছি—তোমারই মেয়ে! মুখখানি দেখলে তোমাকেই মনে পড়ে।

স্বামী-স্ত্রী পরস্পরেই একটু হাসল। তারপর কুশল প্রশ্নের পালা শেষ হ'তে মাধবী বল্‌লে—মাথায় তুমি বড়টি হয়েছে দীন্‌দা, কিন্তু এদিকে তেমনি ছিপ্‌ছিপে;—আচ্ছা কপাল তোমার অমন কেটে গেল কি ক'রে?

দীনু বল্‌লে—আমি কিছুই জানতাম না। ভিড়ের মধ্যের মার ধোর চলছিল···ওই দিক দিয়ে আসছিলাম, কেমন ক'রে একটা ইঁট এসে লাগলো···তারপর হাসপাতালে—

মাধবী বল্‌লে—একে তুমি ভালমানুষ, তার ওপর,—একটু চালাক হও দীন্‌দা, নৈলে বিশেষ সুবিধে কর্‌তে পার্‌বে না! তোমাকে ত চিনি!

কি একটা ইষ্টিশানে এসে গাড়ী থাম্‌লো। স্বামীটি চা খেতে নেমে গেলেন।

মাধবী বল্‌লে—কাজকর্ম্ম কিছু কর্‌ছো? রোজগার না করলে ত আজকাল—

দীনু যেন হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠলো। রোজগারের জন্য তাকে অনেক দুঃখই সইতে হয়েছিল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বল্‌লে—করতাম; কিন্তু বুঝলে মাধবী, এই বড়লোকগুলো আমাদের ভারি কষ্ট দেয়। আমরা কিছু বুঝি না, আমরা গরীব···না হয় আমরা অনেক পাপ করেছি, হয়তো কারো কোনো উপকার করতে পারি না—তা ব'লে তুমিই বল না, এ কি ভাল ?

এতকাল ধ'রে তার জীবনে যেন বলবার মত এই কয়টি কথাই জ'মে উঠেছে।

জানালার বাইরে একদৃষ্টে চেয়ে মাধবী শুধু বল্‌লে—সে দিন যেমনটি ছিলে, আজও তুমি তেমনি আছো দীনুদা।—এতটুকু তোমার বদল হয়নি।

দীনু বল্‌লে—আমি কোনদিন কথা বলতে পাই না, তোমার কাছে আজ কেবলই,—আমার একটি কথাও শোনবার লোক নেই মাধবী।

মাধবী বল্‌লে—বিয়ে হয়েছে তোমার ?

বিয়ে! হুঁ-উঁ—কিন্তু, দেখ ওটা আমি ঠিক বুঝতে পারি না মাধবী! অনেকবারই ভেবে দেখেছি কিন্তু সত্যি বলছি, কিছুই আমার মাথায় আসে না।

বউ কোথায় এখন ?

নেই!—একটু ভেবে আবার সে বল্‌লে—আমাকে সে সইতে পারলো না; তাড়িয়ে দিল একদিন! তা হোক মাধবী, আমাকে সইতে পারে নি, তা ব'লে—না, তার কোন দোষ নেই!

মাধবী বল্‌লে—তবে? এ আবার কি বল্‌ছ?

ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে দীনু বল্‌লে—তা ব'লে আমারও কোন দোষ ছিল না, বুঝলে? কারো দোষ আমি দিতে পারিনে মাধবী।

স্বামীটি আবার উঠে এসে তাঁর ছোট মেয়েটির পাশে বসলেন কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই গার্ডের বাঁশী বেজে ট্রেণ ছাড়লো।

মাধবী বল্‌লে—কিছুই বুঝলাম না দীন্‌দা। যাই হোক; জল খেয়ে নাও, তারপর কথা হবে আবার!

স্বামীটির বোধ হয় রাতে ভাল ঘুম হয়নি; তিনি আবার মুড়ি সুড়ি দিয়ে চোখ বুজলেন। মেয়েটি মায়ের কাছে স'রে এসে বসলো।

খাবার বার ক'রে একখানা রেকাবের ওপর মাধবী সেগুলি সাজাতে লাগলো। দীনু বল্‌লে—আচ্ছা তোমাদের যে বাড়ীটায় আমরা ভাড়া ছিলাম সেটা কি এখনও—কিন্তু সত্যি বলছি মাধবী, কোনো মেয়ে হাতে ক'রে খাবার সাজিয়ে দিয়েছে, তেমন খাবার আমি আজও খাই নি। লোকে শুনলে বোধ হয় হাসে—না?

মাধবী বল্‌লে—যত্ন করবার এটা উপযুক্ত জায়গাই বটে। তা সে যাই হোক, এবার কিন্তু কল্‌কাতায় গিয়ে আমার ওখানে যেও। পরে স্বামীর দিকে একবার চেয়ে চুপি চুপি আবার বল্‌লে—উনি সত্যিই খুব ভাল লোক। বলতে গেলে ঠিক মাটির মানুষ! ওঁর বয়েস একটু বেশি, সাধারণের চেয়ে হয়ত একটুখানি,—কিন্তু যে ওঁকে জানে, ওঁকে নিয়ে যে ঘর করছে, সেই বোঝে উনি আমাদের চেয়ে কত দিক দিয়ে বড়—কতখানি মহৎ!

স্বামীর প্রশংসায় তার টক্‌টকে মুখখানি যেমনি দীপ্ত তেমনি রোমাঞ্চিত হ'য়ে উঠ্‌লো। গভীর শ্রদ্ধায় তার দিকে চেয়ে দীনু বল্‌লে—আমিও সেই কথা বলছিলাম; আমারও ঠিক তাই মনে হচ্ছিল মাধবী।

নিজের কথাগুলি তখনও মাধবীর মনে গুঞ্জন করছিল। একটু থেমে হঠাৎ আবার বল্‌লে—না, বাড়িয়ে আমি বলি না, তা ছাড়া স্বামীর সম্বন্ধে,—আর বাড়িয়ে ব'লে আমার লাভই বা কি!

ছোট মেয়েটি অপার বিস্ময় নিয়ে এতক্ষণ এই নবাগত লোকটির

দিকে তাকাচ্ছিল। খাবারগুলি শেষ ক'রে জল খেয়ে তার দিকে চেয়ে দীনু বল্‌লে—তোমার বিয়েতে আবার নেমন্তন্ন খাবো, কেমন খুকু?

খুকু সলজ্জভাবে মায়ের কাঁধের পাশে মুখ লুকিয়ে রইল।

ঠোঁট উল্‌টে মাধবী বল্‌লে—বিয়ে কি আর হবে! কালো-কুৎসিত মেয়েকে নেবে কে?

কালো!—দীনু অবাক হ'য়ে গেল। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে শুধু বল্‌লে—তোমরা কালো?—মাধবী, অনেকদিন আগেকার একটা কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে! তুমি কেবলই আমার কাছে এসে নিজেকে কালো বলতে! অথচ তোমার মতন রূপ আমি জীবনেও কোনদিন—সত্যি বলছি, সুন্দরী মেয়ে কোথাও দেখলে আমি তোমারই কথা ভাবতাম! তারপর এই আট বছর ধ'রে কতদিন খুঁজলাম কিন্তু কোথাও তোমাকে—

মাধবী তার নির্বোধ মুখখানার দিকে চেয়ে হঠাৎ ঝড়ের মত খিল খিল ক'রে হেসে উঠলো। বল্‌লে—এবার কিন্তু না হেসে থাকতে পারলাম না; মেয়েমানুষের বিয়ে হয়ে গেলে তাকে আবার কেউ খোঁজে! তুমি ত বেশ লোক দীনুদা?

বোকার মত দীনু বাইরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। তাইত! এই করুণ নির্বুদ্ধিতার কথা তার মাথায় ত কোনদিন আসেনি! পরে ঘাড় ফিরিয়ে নিতান্ত অপরাধীর মত সে বল্‌লে—এ কথা আমি জানতাম না মাধবী, খুঁজলে যে দোষ হয় তা আমার জানা ছিল না।

হাসির রেশ মাধবীর মুখের ওপর থেকে তখনও স'রে যায় নি। বল্‌লে—খুঁজতেও নেই, এমন কি তার কথা ভাবতেও নেই! এবার মনে থাকবে?

কি ভেবে দীনু বল্‌লে—আচ্ছা, তবে যে তুমি ডেকে এখন আমার

সঙ্গে কথা কইলে, এ নিয়ম বুঝি আছে ?—কিন্তু ধর যদি মনে মনে তোমাকে ভাবি তাহলে,—আর এই যে তুমি এখন কি ভাবচ তা কি আমি জানি ?

একটু হেসে মাধবী চুপ ক'রে গেল। আর যাই হোক এ সরলতার কোনো প্রতিবাদ নেই।

হাবড়ার ইষ্টিশানে ততক্ষণে গাড়ী এসে গেছে।

তা ব'লে জীবন-সংগ্রাম তাকে রেহাই দিল না। উদ্দেশ্যহীন কি একটা আশা নিয়ে বায়ুতাড়িত শুষ্কপত্রের মতই তাকে এখানে ওখানে উড়ে বেড়াতে হয়। নিজস্ব কোন প্রতিষ্ঠিত মতামত নেই, অর্থহীন কোন মিথ্যা স্বপ্নও মাথার মধ্যে আর ঘোরে না! না আছে জিজ্ঞাসু কোনো কৌতূহল ; নিজের কোন কিছু শক্তি আছে কি না,—এ সমস্ত নিতান্তই তার কাছে কুহেলিকাময়। চিন্তা! তাও ত নেই! সংসার যেন তার চোখে কেমন দুর্বোধ্য জটিলতায় ভরা। মাঝে মাঝে বিস্মিত দৃষ্টিতে চারিদিকে সে তাকায় কিন্তু কোনো অর্থই তার মনে আসে না।

মাধবী ? হাঁ মাধবীকে মনে পড়ে। শরতের আকাশকে দেখে তার চোখদুটির কথাই ভাবতে হয়। সর্ব্বাঙ্গে যেন তার সূর্য্যাস্ত-শোভা। সবুজ তৃণক্ষেত্র বাতাসে দুলে উঠলে তার দেহখানিকে মনে পড়ে। মাঝে মাঝে দীনুর সমস্ত অন্তর তার হাসি মুখখানির চারিপাশে মক্ষিকার মত গুঞ্জন ক'রে বেড়ায়। কিশোর বয়সের বান্ধবীটির প্রতি বিপুল শ্রদ্ধায় তার চোখে জল এসে পড়ে। মাধবী চমৎকার!

রাত্রে অন্ধকার ঘরের মধ্যে শুয়ে শুয়ে নিজের ভিতরে কি একটা জটিল আন্দোলন অনুভব করে। কতকগুলি অন্যায় দুরাশা ছায়ামূর্ত্তি ধ'রে তার চোখের সুমুখে এসে চক্রান্ত করতে থাকে।

চোখ বুজে ভাবে ;—মাধবী! এই মেয়েটিকে সে একেবারে ভুলেই গিছলো বলতে হবে। কিন্তু সেদিন অকস্মাৎ তাকে দেখে মূক মন

যেন মুখর হ'য়ে উঠেছিল। এই মেয়েটির কাছে সহানুভূতির ইঙ্গিত পেয়ে তার জীবনের বস্তুহীন রসহীন অসংলগ্ন ঘটনাগুলি কেমন ক'রে বেদনায় ভ'রে উঠেছিল তা কি সে নিজেই জানতে পেরেছে। মাধবীর নীল দুটি চোখের ছায়ায় শুধু যে আলো আছে তা নয়, মানুষের দীনতার কারুণ্যও সেখানে লুকিয়ে রয়েছে।

সকালের আলোয় এ সব কথা ধোঁয়ার মত আবার মিলিয়ে যায়।—

পথে নেমে হঠাৎ কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা। বোকার মত পিছন থেকে ডাক দিয়ে বলে—হীরালাল যে, ভাল ত?

বহুদিন পরে হীরালাল তাকে পথে দেখতে পেয়ে একটু বিস্মিত হয়; বিজ্ঞের মত ঠোঁটের পাশে একটু হাসি টেনে বলে—বারে দীনু, এমন ক'রে ডেকে কথা কইতে আবার কবে শিখ্‌লি? কি করিস্ আজকাল?

এই ভাই, যদি কাজ এবার একটা কিছু পাই তবে—

ও, তা যাবে যা হোক একটা জুটে! তবে চাকরীর বাজার আজকাল,—আচ্ছা আসি রে; একবার আমায় ব্যাঙ্কে যেতে হবে; ব'লে সে তার ছেঁড়া পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটি বিড়ি নিয়ে ধরাতে ধরাতে চ'লে যায়।

কিছুদূর গিয়ে আবার আর একজন। পিছন থেকেই ডাকে বটে।

হরিদাস, চিন্‌তে পারো?—ওঃ না না, ভুল হ'য়ে গেছে, কিছু মনে করবেন না। হরিদাস ঠিক আপনারই মতন—

ভুরু কুঁচ্‌কে একবার তাকিয়ে লোকটা কি ভেবে চ'লে যায়।

পথে চলতে চলতে ভাবে তাকে কেন্দ্র ক'রেই যেন এই অফুরন্ত জীবন-প্রবাহ ব'য়ে চলেছে। অগণন বিচিত্র চরিত্র। কারোকে বাদ দিলে চলবে না! স্নেহ যে করে তাকেও চাই, ঘৃণা কিম্বা অবহেলা যে করে তাকেও প্রয়োজন!

ভাবতেই ভাল লাগে; শহরের প্রশস্ত রাজপথে চল্‌তে চল্‌তে নিজেকে মূল্যবান মনে করায় যেন অপরিসীম তৃপ্তি আছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে মাধবী বল্‌লে—কড়া নাড়া শুনেই বুঝতে পেরেছি। মনে ক'রে এলে তবে?

দীনু বল্‌লে—বাঃ আসতে ত হবেই, তোমার যখন আবার দেখা পেয়েছি তখন—

মাধবীর মুখে চোখে যেন রক্ত জ'মে উঠ্‌লো। এদিক ওদিক চেয়ে বল্‌লে—এসব ছেলেমানুষী কথা যেন ওঁদের কাছে ফস্ ক'রে ব'লে ফেল না বাপু।—এসো।

ভেতরে পা বাড়িয়ে দীনু বল্‌লে—উটি কে? নির্ম্মলা ব'লে মনে হচ্ছে যেন?

মাধবীর ইঙ্গিতে একটি লজ্জানতা কিশোরী স'রে এসে হেঁট হ'য়ে দীনুর পায়ের ধুলো নিতেই—

থাক্ থাক্, ওইখান থেকেই—আমার এই নোংরা পায়ের ধুলো, তা ছাড়া বুঝলে মাধবী, আমার পায়ের ধুলোরও দাম নেই, আশীর্ব্বাদেরও না।—আচ্ছা, সেই নির্ম্মলা এত বড় হ'ল?

মাধবী ঘরের কাছে এসে বল্‌লে—দিন যাচ্ছে বছর যাচ্ছে, বড় হ'তে আর দোষ কি বল!

বিস্ময়ের ঘোর তখনও দীনুর কাটেনি। বল্‌লে—তাই ত! আর ক'বছর বাদে বোধ হয় ছেলেপুলেও হ'য়ে যাবে?

একটি প্রবল হাসির আবেগ চেপে মাধবী মুখ ফিরিয়ে নিল।

নির্ম্মলা ঠিক তেমনি নিঃশব্দে চ'লে গেল। সেইদিকে চেয়ে মাধবী বল্‌লে—সেদিন সাত বছরের নির্ম্মলাকে মধ্যস্থ রেখে আমাদের কথাবার্ত্তা চলতো—মনে আছে দীনুদা?

মুখের দিকে চেয়ে দীনু বল্‌লে—তুমি কিন্তু ভারী দুষ্টু ছিলে

মাধবী বল্‌লে—আমার দুষ্টুমিটাই বুঝি মনে আছে?

এ এক প্রকারের তিরস্কার এ কথা দীনু বোঝে। বল্‌লে—তোমার মুখ থেকে সব কথাই ভাল লাগে মাধবী কেন বল ত?

কথার কোনো মাথামুণ্ড নেই!

কিন্তু মাথামুণ্ড ছাড়া আর যদি কিছু থাকে ত তার জন্যে লজ্জিত হওয়া উচিত।

ঘর থেকে বাইরে গিয়ে মাধবী দাঁড়ায়। এমনি অনাবশ্যক বেরিয়ে আসার কারণ কি সে নিজেই বোঝে। বলে—নির্ম্মলা, শুনে যা। দীন্‌দাকে বোধ হয় চিনতে পারিসনি? ও তোকে কতদিন কাঁধে ক'রে বেড়িয়ে এনেছে।—খাবারের ব্যবস্থা কর্‌ ভাই ততক্ষণ,—উনি কোথায়?—শহরে গেছেন বুঝি?

ঘাড় নেড়ে নির্ম্মলা শুধু সম্মতি জানিয়ে দিল।

ঘরে এসে একটা চৌকির ওপর বসে প'ড়ে মাধবী বল্‌লে—মা ম'রে গেলেন, দাদা নিলেন বিদেশে চাকরি,—নির্ম্মলাকে তাই আমিই এনে রাখলাম।

ঘরের ভেতর চারিদিক চেয়ে চেয়ে দীনু বলতে লাগলো—ভুলেই গিছলাম তোমার কাছে আসছি! কাল রাতে অনেক কথা তোমায় বলবো ব'লে গুছিয়ে রেখেছিলাম কিন্তু এখানে এসেই—তা ছাড়া আর একটা কথা ভাবছি মাধবী—এতকাল পরে দেখা হ'য়ে কথার পর আর কথা খুঁজে পাচ্ছি না।

মাধবী বল্‌লে—তুমি থাকো কোথায়?

দীনু হেসে বল্‌লে—এ বেশ কথা তোমার! থাকবার জায়গা প্রায়ই আমাকে জোগাড় ক'রে নিতে হয় যে! মাধবী, আমার এই আট বছর কেমন ক'রে কেটে গেছে তা শুনলে তুমি হয়ত—

ছোট মেয়েটি এবার ঘরে ঢুকে মার কাছে এসে দাঁড়ালো। দীনু তাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বল্‌লে,—খুকুমণি, যাবে আমার সঙ্গে?

হাসতে হাসতে মাধবী বল্‌লে—কান টানলেই মাথা যায় দীনুদা ; মেয়ে নিয়ে যাওয়া মানে মেয়ের মাও সেই সঙ্গে—

হাতটা বার বার ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দীনুও হেসে বল্‌লে—নেই, নেই —ভাঙা ঘরের চাল ছাওয়া নেই, মাটির দেওয়াল কবে পড়ে! চাল-ডালের দানাটিও—হুঁ হুঁ, নিয়ে গিয়ে রাখবো কেমন ক'রে ?

আর মেয়ে নিয়ে গেলে বুঝি খাওয়াতেও হয় না, থাকবার জায়গা দিতেও হয় না!

তা হোক, একে আমি কাঁধে কাঁধে নিয়ে ঘুরতে পারি, কিন্তু তোমাকে—না না মাধবী, আমার ঘরে গিয়ে তুমি কষ্ট সইবে সে আমি ভাবতেই পারি না !

মাধবী তাকে বাধা দিয়ে কলকণ্ঠে হেসে উঠলো।—আমার যাবার কথা তুমি বুঝি সত্যি ব'লে ভাবছিলে ? তোমার বোকামীর জ্বালায় কি করি বল ত দীনুদা ? আমি যে লোকের বাড়ীর বউ একথা ভুলতে তোমার এক মিনিটও লাগে না দেখছি। আচ্ছা পাগল তুমি ত ?

না তা আমি ভুলিনি, আমি বলছিলাম যে—আচ্ছা বন্ধুর বাড়ীতে যদি বন্ধু গিয়ে ওঠে তা হ'লে—

তা হ'লে বন্ধুত্বটি কেমন হয় দানুদা ? বাইরের একটা লোকের সঙ্গে ঘরের বউয়ের বন্ধুত্ব—এ ত' আর অরাজক নয়!—মাধবী আর একবার হাসবার চেষ্টা ক'রে নীরব হ'য়ে গেল।

কাতর কণ্ঠে দীনু শুধু একবার বল্‌লে—আমি যা বলতে চাইছি, কিন্তু তুমি তা ঠিক বুঝবে না মাধবী।

মাধবী আর কোন কথা কইল না। চুপ করে সে যেন নিজের প্রতিই নিঃশব্দে চেয়ে রইল। প্রকাশ করে না বল্‌লে এ নিঃশব্দতার কি কোন বর্ণনা আছে!

ঘরের মধ্যে এর আগেই একটু একটু অন্ধকার হ'য়ে এসেছিল।

এতক্ষণে ভেতরে ঢুকে টুলের উপর একটি আলো রেখে কোন কথা না ক'য়ে নির্ম্মলা ধীরে ধীরে বেরিয়ে চলে গেল। যেমন আসা ঠিক তেমনিই চ'লে যাওয়া! এমন কোন চিহ্নই সে রেখে গেল না যাতে এতটুকুও তাকে বোঝা যায়।

পীড়াদায়ক একটা নীরবতা অনুভব ক'রে দীনু হঠাৎ বল্‌লে—মতিবাবু এলেন বুঝি?—পায়ের শব্দ হ'ল না কার?

স্বামীর নাম শুনেই মাধবী যেন সজাগ হ'য়ে উঠ্‌লো। বল্‌লে—এলেন? জানি আমি একদণ্ড উনি কোথাও গিয়ে থাকতে পারেন না! কই? এলেন না ত?

পায়ের শব্দ কারো নয়। দীনু শুধু একটুখানি বুদ্ধির পরিচয় দিয়ে ফেলেছিল মাত্র। মাধবী কিন্তু বলতে লাগলো—ননদের বাড়ী আজ যাবার কথা ছিল; যেতে কি চান্! ধ'রে বেঁধে জোর ক'রে তবে পাঠিয়েছি। লোকটি এই রকম বুঝলে দীন্‌দা? স্বামীর কথা বলতে গেলে লজ্জা করে কিন্তু আমি বলতে পারি একশোটার মধ্যে একটা মেয়েও আমার মতন এমন সুখে থাকতে পায় না। ওঁর বয়েস হয়েছে, সংসারী লোক—আর এই ধর আমরা যা চাই—আমোদ আহ্লাদ উনি বিশেষ ভালবাসেন না; তা হোক, স্বচ্ছল অবস্থার মধ্যে খেয়ে প'রে ভালভাবে থাকাই কি এখনকার মেয়েদের পক্ষে কম?

দীনু বল্‌লে—তুমি কিন্তু তাই ভালবাসতে মাধবী। গোলমাল যেখানে নেই সেখানে তুমি যেতে না। আর দুষ্টুমি না করলে বেশ মনে আছে তুমি ঘুমোতেই পারতে না। সে ত' আর বেশিদিনের কথা নয়! একটু থেমে আবার বল্‌লে—তোমার হাসির শব্দ ঘর দোর ছড়িয়ে শোনা যেত!

মাধবী বল্‌লে—বাঁচতে গেলে অনেক জিনিসই ছাড়তে হয় দীন্‌দা! তা ব'লে ওঁকে আমি ছোট করতে পারবো না। কি না করেছেন আমার জন্যে! পাছে অসুবিধেয় পড়ি এ জন্যে ভাঁড়ারের

জিনিস পত্তর আগে থাকতে এনে রাখেন। জামা, কাপড়, হাতখরচ—কিছুই চাইতে হয় না! লোককে আদর আপ্যায়িত,—আর অমন পরোপকারী লোক আজকাল ত চোখেই পড়ে না। এদিকে এমন কেউ নেই যে ওঁর কাছে সাহায্য পায়নি। নির্ম্মলা আমার এখানে থেকেই ত মানুষ হলো!

আলোর দিকে চেয়ে দীনু বসে রইল। পরম শ্রদ্ধাভরে মাধবীর কথা শুনতে শুনতেও তার মনে হচ্ছিল কোথায় যেন কি গোলমাল ঘ'টে যাচ্ছে।

মাধবী আবার বলতে লাগলো—স্বামীর সঙ্গে যা হোক একটা বনিবনা না করলে আজকাল মেয়েদের আর বাঁচবার কোনো উপায় নেই—বুঝলে দীন্‌দা?

দীনদা ত সবই বোঝে! কথা বলা আর না-বলা তার কাছে দুই-ই সমান।

মাধবী কিন্তু নিজের খেয়ালেই ব'লে যায়।—লোকের চোখে যখন অভাব আমার কিছুই নেই তখন মিথ্যে জিনিসের জন্যে দাবি জানিয়ে,—আর তা লোকে শুনবেই বা কেন?

একটি থালায় কতকগুলি খাবার আর জল এনে রেখে নির্ম্মলা চলে গেল।

সেইদিকে চেয়ে দীনু হঠাৎ বল্‌লে—বাঃ, ভারী শান্ত মেয়ে কিন্তু। তোমার বোন ব'লে মনেই হয় না।

মাধবী চট্ ক'রে ব'লে বসলো—অমনি একটি বৌ তোমার হ'লে কেমন হয়?

হঠাৎ সজাগ হ'য়ে অপার বিস্ময়ে মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে দীনু বল্‌লে—ধ্যেৎ! একবার বিয়ে হ'য়ে গেলে কি আবার;—আজ কিন্তু আমি চললাম মাধবী।

খেয়ে যাও ওগুলো?—বা রে!

খাবারে দীনুর রুচি চলে গিয়েছিল। তবু বসে প'ড়ে কোনরকমে সে নাকে মুখে গুঁজতে লাগলো।

খেয়ে কিন্তু পালালে হবে না! তোমার নিজের কথাই বল শুনি। আগাগোড়া না বললে যেতে দেবো না কিন্তু।

খেতে খেতেই দীনুর আত্মকাহিনী সুরু হ'ল।

শেষ যখন হ'ল, ঘরের ভেতরটা যেন শ্বাসরুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে।

একটু পরেই দীনু উঠে দাঁড়ালো। আলোয় দেখতে পেলে মাধবীর চোখে জল ভ'রে উঠেছে। বিদায়ের আগে একটুখানি কাছে স'রে এসে সে বললে—আবার যদি এ পথে কোনোদিন আসি, আর নৈলে—

কাতর চক্ষু দুটি তুলে মাধবী শুধু বললে—বেঁচে সুখ নেই দীনদা!

দীনু নিঃশব্দে বেরিয়ে এল। এল বটে কিন্তু মাঝপথে আবার তাকে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। আলোটা দূরে রেখে গলায় আঁচল দিয়ে হেঁট হয়ে নির্ম্মলা পুনরায় একটি প্রণাম করলে; তারপর উঠে আবার চ'লে গেল।

নিরর্থক একটি প্রণাম! তার কোন ভূমিকাও নেই, যুক্তিও কি ছিল কিছু?

দীনুর আত্মকথার প্রতি এ কি তার সশ্রদ্ধ সহানুভূতি? অবশ পা দুটো টেনে টেনে দীনু বেরিয়ে চলে গেল।

বলেছে—বেঁচে সুখ নেই!

লক্ষ প্রশ্ন তুলে ওই কথাটা তার দিকে যেন ধেয়ে আসে। কানের মধ্যে কেবলই গুন্‌গুন্ করে। দীনুর মনে হয় এই কথাটির বয়স নাই, ইতিহাস নাই,—অনন্তকাল ধ'রে মানুষের অন্তর-লোক ওই কথাটির

দিকে চেয়ে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলচে। অচেতন মনোবৃত্তির মধ্যে এই কথাটি বাসা বেঁধে দীনুকেই কি স্থির হ'য়ে কোথাও থাকতে দিয়েছে? বিদেশে, বিপথে, জনতার অরণ্য-মধ্যে, বিক্ষোভ-বেদনার স্রোতে স্রোতে তাকে চিরকাল নিরুদ্দেশ করেছে! ওই কথাটি কি তাকে ভিখারিই করেনি!

কিন্তু মাধবী কেন বললে—বেঁচে সুখ নেই!

সুখ যদি নেই তবে বাঁচবার অধিকার কি দীনুরই এত বড়! নাকি মানুষের এই মরুভূমির মাঝখানে ওই কথাটার বোঝা টেনে টেনেই তাকে চিরদিন বেড়াতে হবে!

তাই যদি হয় ত মাধবীর চিন্তা আজ ভিতর-বাহিরের সকল দৃষ্টিকে এমন করে ছেয়ে আছে কেন!

মাধবী! সত্য-মিথ্যায় অপরূপ হ'য়ে জড়িয়ে আছে এই মাধবী! মাধবী তার কণ্ঠে দিল ভাষা, হৃদয়ে দিল সঙ্গীত, পায়ে পায়ে এনে দিয়েছে পথ চলার একটি ছন্দ!

জীবনের আর একটি নূতন রূপের সঙ্গে দীনুর যেন মুখোমুখি দেখা হয়।

মাধবীর সেই মুক্তাফলের মত অশ্রুবিন্দু দুটি চূর্ণীকৃত হ'য়ে রাত্রির আকাশে তারা হয়ে ছড়িয়ে থাকে। দক্ষিণের হাওয়ায় তার নীল বসনাঞ্চল ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হ'য়ে ওঠে। মাধবীর মৃদু নিঃশ্বাস রজনীগন্ধার উপবনকে দোলা দিয়ে যায়।

পড়ো একটা জমির ধারে বসে দীনু ভাবতে থাকে। ভাবে মাধবীর দেখা পাওয়াই যে তার পক্ষে অনেক বড় কথা। এতদিন পর্য্যন্ত কোথাও কোনদিন সে সত্যকারের একটি নারীর দেখা পায়নি! যেমন করেই হোক, মাধবীর হাতে মমতার অর্ঘ্য-ডালা দেখে তার মনে হয়েছে, মরণই একমাত্র সত্য নয়—কিম্বা কাম্যও নয়; আনন্দহীন মৃত্যুই হচ্ছে জীবনের একমাত্র পাপ!

আবার উঠে দীনু লোকের ভিড়ের মধ্যে মিশে যায়। বিচ্ছিন্নতা থেকে স'রে গিয়ে জনতার সঙ্গে এক হ'য়ে মিলিয়ে যেতেই তার কেমন যেন ভাল লাগে।

সকলের মাঝখানে বেঁচে তাকে থাকতেই হবে! এই মূক, মৌন, পঙ্গু, বেদনাময় জীবনের প্রদীপটির মুখে অনির্ব্বাণ আনন্দের শিখাটি জ্বালিয়ে রাখাই ত তার মত পতিত সন্তানের একমাত্র কাজ!

ইতিমধ্যে আরও দু' একদিন গিয়েছিল বটে। যায় যখন তখন একেবারে রাজবেশ! জীর্ণ শতছিন্ন জামা কাপড়গুলি তার দেহটিতেই যেন একচেটে অধিকার সাব্যস্ত ক'রে থাকে তা হোক,—দীনুর যেন প্রতিদিনই উৎসব লেগে আছে।

হয়ত এমনই হয়। যেখানে থাকে খানা-ডোবা, যেখানে আবর্জ্জনা, ক্লেদঘন স্তূপীকৃত গ্লানির বোঝা যেখানে,—আকাশ থেকে জ্যোৎস্না-লোক এসে তাদের সুন্দর ক'রে তোলে!

সেদিন যেতেই মতিবাবু বললেন—বেশ বেশ, মানুষের কুটুম্ এলে-গেলে! খাওয়া-দাওয়া ক'রে তবে যেও। আমার আবার—বুঝলে হে, ওই তোমার উত্তরপাড়ায় নূতন পুল বাঁধা হচ্ছে,—সুরকি চালানির ঠিকা নিতে হয়েছে। লোকের সঙ্গে ভদ্রতা রাখতে দিচ্ছে না। আর তুমি ত এখন ঘরের লোক, সবই মানিয়ে নিতে পারবে।

হেল্‌তে দুল্‌তে পান চিবোতে চিবোতে নাদুস নুদুস মানুষটি বেরিয়ে চ'লে যান্।

মাধবীকে দেখে এক নিঃশ্বাসে গল্ গল্ ক'রে দীনু কথা ব'লে যায়;—বাঁচলাম মাধবী, তোমাদের দেখা পেয়ে আমার খুব লাভ হয়েছে কিন্তু। আর এই ধর, আমি ত বোবা নই, আমিও ত গুছিয়ে গুছিয়ে অনেক কথা বলতে পারি! নৈলে তোমাকে দেখে অবধি—

মাধবীও বললে—আমিও বাঁচলাম, তোমার মুখে হাসি দেখা ভাগ্যের কথা।

বোকার মত দীনু বললে—তাই ত! আর এই দেখো, ভেতরে ভেতরে দম্ আট্‌কে থাকা কি ভাল? মাধবী, সত্যি বলছি, তোমার সঙ্গে আবার যদি দেখা না হতো, তাহ'লে আমার নিজেকেই নিজের এত ভাল লাগতো না!

মাধবীকে একটু উপদেশ দিতেও ছাড়ে না। বলে—বেঁচে সত্যিই সুখ আছে। তা না হ'লে তোমার দেখা পেতাম কি ক'রে! আর ধর, এই যে আমরা আমোদ-আহ্লাদ ক'রে বেড়াই, এ সব কি একেবারে পাগলামি? ম'লেই ত ছাই হ'য়ে যেতে হবে মাধবী!

কথায় কথায় সে আবার দার্শনিক তত্ত্ব সুরু ক'রে দেয়। চুপ ক'রে থাকা ছাড়া মাধবীর আর উপায় কি! সরল উদার বিশ্বাসে নিতান্ত শিশুর মত দীনু তার মুখের দিকে চেয়ে বলতে লাগলো—মাধবী, তুমি আমাকে মানুষ ক'রে দিলে এ কথা ভুলতে পারবো না! আমি যে অনেক দুঃখ পেয়েছি তাও তুমি আমায় শেখালে! তা হোক, ভগবান আমাদের অন্যায় দুঃখ দিয়েছেন দিন্, তার বদলে আমাদের প্রার্থনা তাঁর কাছে;—ও কি খুকুমণি, মাথায় ময়ূরের পালক পরেছ, বেশ দেখতে হয়েছে কিন্তু, আর নির্ম্মলা? তার বুঝি কেবল কাজ আর কাজ!—মাধবী, তুমি শুধু নিজের কথাই ভাবচো, না?

মাধবী বললে—মেয়েমানুষের নিজের কথা ভাবতে গেলে কি আর চলে দীন্‌দা?

ফোঁস ক'রে একটি নিঃশ্বাস ফেলে দীনু বললে—সত্যিই ত! ভাল মেয়েদের লক্ষণই ওই। তুমি কিন্তু অমন ক'রে একদিকে চেয়ে থাকলে আমার চোখে জল আসে, তা বলচি।

মাধবী ম্লান হাসি হেসে কি যে একটি জবাব দিল, বোঝাই গেল না।

দীনু হঠাৎ বললে—চোখের জল, হাই হুতোশ, হাঁ ক'রে চেয়ে কি দুঃখ পেয়েছি তার কথা ভাবা—এ সব আর তেমন তোমার গিয়ে,

বুঝলে না ? দুঃখ বললেই দুঃখ বেড়ে যায় ! তার চেয়ে বরং—আর তা ছাড়া আমাদের সকলেরই বিয়ে করা উচিত, নৈলে এত বড় সংসারটা—তুমিই বল না মাধবী ?

মাধবী বললে—বিয়ে তোমাকে করতেই হবে। আমি ত আগেই বলেছি যে—

কি আশ্চর্য্য, এসব কি আমার নিজের কথা ! সবই ত তোমার !

সেদিন মাধবীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন দীনু বেরিয়ে এল, রাত তখন অনেক। রাস্তার দিককার ঘরের সুমুখের জান্‌লাটা খোলাই ছিল ; খড়্‌খড়ির ফাঁকে নজর পড়তেই সে দেখ্‌লো, মুখের কাছে আলোটি জ্বেলে রেখে নির্ম্মলা ঠাণ্ডা মেঝের উপরেই উপুড় হ'য়ে শুয়ে বাইরের দিকে চেয়ে আছে। অবারিত অন্ধকার রাত্রির দিকে চেয়ে সে কি ভাবছিল কে জানে, কিন্তু জলভারাক্রান্ত চোখ দু'টি তার আলোয় চক্ চক্ কচ্ছিল।

ধীরে ধীরে দীনু সেখান থেকে স'রে গেল।

আশপাশের নোংরা জায়গাগুলো রাতদিনই হতশ্রী হ'য়ে থাকে। যে যার পরস্পরের ওপর পরিষ্কার করবার ভার চাপিয়ে দিয়ে বেশ নিশ্চিন্ত আরামে দিনগুলি কাটিয়ে যায়।

দীনু সেগুলি মুক্ত ক'রে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে ক'রে তুললে। বাঁ দিকে একটুখানি অনাবশ্যক পরিত্যক্ত জমি পড়েছিল, সেদিন দুপুর বেলায় সে-জায়গাটার মাটি কেটে সে দু'একটা ফুলগাছের চারা বসাতে লাগ্‌লো।

কোনো বিক্ষোভ-দাহন, কোনো গ্লানি-ব্যর্থতা এখন আর তার মধ্যে নেই। এই জীবনেই তার জন্মান্তর সুরু হ'য়ে গেছে। সে নিজেই এখন নিজের স্রষ্টা। গত জন্মের বেদনাকে সে এ জন্মের আনন্দে রূপান্তরিত করেছে।

হঠাৎ কার পায়ের শব্দ শুনে সে চমকে উঠ্‌লো এবং মুখ ফিরিয়ে যা দেখলে তাতে অকস্মাৎ তার বাক্‌রুদ্ধ হ'য়ে গেল।

ছোট মেয়েটির হাত ধ'রে মাধবী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসচে। পিছন থেকে নির্ম্মলা একদৃষ্টে তার দিকে চেয়ে আছে।

মাধবী বললে—গুন্ গুন্ ক'রে গান গাচ্ছিলে শুনছিলাম। তুমি যে গাইতে পারো তা কে জান্‌তো বল!

অস্ফুট অবরুদ্ধ কণ্ঠে দীনু শুধু বললে—এলে তোমরা, কিন্তু তোমাদের বসাবার জায়গা ত নেই মাধবী!

জায়গা দিতে হয় না দীন্‌দা, জায়গা ক'রে নিতে হয়!—নির্ম্মলা, ভেতরে আয় ভাই—বসি গে। দীন্‌দা হয় ত সত্যিই আমাদের বস্‌তে বল্‌বে না!

ছোট মেয়েটির হাত ধ'রে ভেতরে গিয়ে মাধবী বলতে লাগলো—চমৎকার! ঘর ত নয় একেবারে বাসর-ঘর! দীন্‌দা, তুমি সত্যিই সৌখীন!

জড়ের মত নিশ্চল হ'য়ে দীনু দাঁড়িয়ে রইল। মাধবীরা যে তার ঘরে আসতে পারে,—এ যেন কাঙালের ঘরে অকস্মাৎ রাণীর আনাগোনা সুরু হ'য়ে গেল!

চঞ্চলপদে বেড়িয়ে বেড়িয়ে মাধবী আবার বললে—তোমার মেয়েলি ভাবের নিন্দে যে করবে সে সত্যিই ভুল করবে! তোমার ভেতরটা মেয়ে কিন্তু মাথাটা তোমার নির্জ্জলা পুরুষের মাথা!—আচ্ছা, আমরা কেন এলাম তা ত কই একটিবারও জিজ্ঞেস করলে না!

তোমরা কি পর? দীনু বললে।

খিল্ খিল্ করে হেসে মাধবী বললে—একেবারে ঘরের লোক, না?—শোনো বলি, এদিকে এসো। ও কি, চললে যে! না না, তা হোক, তোমার মাটি-মাখা হাত নিয়েই এসো। নির্ম্মলা, আয় ভাই, লজ্জা কি!

দীনু একেবারে দিশাহারা হ'য়ে কাছে এসে দাঁড়াল। পা দুটো তার থর থর কচ্ছিল।

মাধবী তার একটি হাত নিয়ে নির্ম্মলার হাতখানি তার মধ্যে রাখলে। বললে—এর চেয়ে বড় আশ্রয় নির্ম্মলার আর নেই! দীন্‌দা, তোমার কিছুই নেই তবু যা আছে তা হয়ত রাজার ঘরেও খুঁজে পাওয়া যায় না! নির্ম্মলার ভার তুমি নাও!

দীনুর অবশ ঠাণ্ডা হাতখানার কাঁপুনি আর থামে না। বললে—কিন্তু মাধবী—

থাক্ বুঝতে পেরেছি। নির্ম্মলা তোমাকে চিনেছে! তুমি স্বামী হবে এ তার ভাগ্যের কথা!

কিছুক্ষণ পরে হাতখানি ধীরে ধীরে ছাড়িয়ে নিয়ে নির্ম্মলা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথা যেন আর দীনুর মুখ দিয়ে বেরোচ্ছিল না। অতিকষ্টে মৃদু কণ্ঠে শুধু বল্‌ল—একটা যেন ঝড় হয়ে গেল মাধবী।

মাধবী শুধু তার মুখের দিকে চেয়ে একটুখানি হাসবার চেষ্টা করলে কিন্তু হাসির বদলে দুইটি চোখ ফেটে তার অশ্রু গড়িয়ে এল।

যাই হোক, সেদিনকার সেই জীর্ণ গৃহখানির আনন্দ ও বেদনার উৎসব—মনে হলো যেন উর্দ্ধায়িত সঙ্গীতের মত আকাশের দিকে ছুটে চলেছে।

বছরও বুঝি শেষ হ'য়ে যায়।

কেমন ক'রে না জানি এক একটি গভীর রাত্রে দীনু জেগে ওঠে। বুকের মধ্যে একটি পোকা যেন বাসা বেঁধেছে; মাঝে মাঝে কুরে' কুরে' সে জাগিয়ে দেয়।

ধীরে ধীরে সে উঠে বসে। শিয়রের মৃত্তিকা-দীপটি নিবে গেছে। ঘরের একধারে এক ঝলক চাঁদের আলো এসে পড়েছে।

পাশেই নির্ম্মলা! নিদ্রিত,—মুখে চোখে কমনীয় একটি শান্তি স্থির হ'য়ে আছে। সুকোমল দুটি বাহুলতা একান্ত নির্ভরশীল! সমস্ত দেহখানি ঘিরে নিশীথ রাত্রির একটি মায়া ঘনিয়ে ওঠে!

মুখের ওপর ঝুঁকে প'ড়ে দুটি আঙুল দিয়ে দীনু তাকে স্পর্শ করতে যায়; কিন্তু ভয় করে। প্রশান্ত নিশ্চিন্ত নিদ্রাটি তার ভাঙাতে কেমন যেন বাধে।

উঠে গিয়ে জান্‌লার কাছে সে দাঁড়ায়। দূরে মৃদু বাতাসে ক্ষণে ক্ষণে নারিকেল গাছগুলি মর্ম্মরিত হ'য়ে নিবিড় রাত্রিকে অভিভূত করে তোলে। চোখের চারিদিকে জল-স্থল-আকাশ পরিব্যাপ্ত ক'রে জ্যোৎস্নার নিঃশব্দ প্লাবন যেন স্তব্ধ হ'য়ে গেছে—।

কেবল তারই হাতের বসানো দুটি রজনীগন্ধার চারা ফুলের ভারে অবনত হ'য়ে মাতালের মত এদিক ওদিক দোলা খায়।

মনে হ'ল, এ ছাড়া মানুষের আর কি কামনা থাকতে পারে!

॥ তিন ॥

'পৃথিবীতে এখনো রয়েছে কিছু বন্ধুত্ব, কিছু প্রেম, হতাশ হবার কোনো কারণ নেই সুনন্দা···দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও সুনন্দা, তোমাকে দেখিনি অনেকদিন—'

সুনন্দা পথের উপরেই থমকিয়া দাঁড়াইল। মুখে বিরক্তির আভাস প্রকাশ করিয়া কহিল, 'আমার বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তোমার 'বেলা হয়ে যাচ্ছে'—লোকটি হাসিয়া বলিতে লাগিল, 'তোমার অনেক কাজ, তোমার জীবন-সংগ্রাম, তোমার ইস্কুলে পড়ানো···সত্যি, একটু সাবধানে পথ হেঁটো, আঁচলটা একটু সামলে; জানোই ত, বড় রাস্তা—বাস্‌, ট্রাম, মোটর,—সাবধান সুনন্দা, সব আশা তোমার এখনো মেটেনি—'

সুনন্দা কহিল, 'আপনি কি বলতে চান বলুন—' কালো ফিতা-বাঁধা সোনার ছোট রিষ্টওয়াচটা সে একবার হাত তুলিয়া দেখিয়া লইল।

'বলবার এমন কিছুই নেই. এই কেবল দেখা হয়ে গেল তাই—কিন্তু কেন তোমার এই তাড়াতাড়ি যাওয়া-আসা ? হ্যাঁ, মাষ্টারী করা ভালো, টাকা পয়সা নৈলে কি স্বাধীন হওয়া চলে, তোমরা যে আবার স্বাধীন মেয়ে; আজকাল স্বাধীন মেয়ের খুব ডিমাণ্ড, না সুনন্দা ? আচ্ছা, তুমি যদি আজ একটা ভালো বিয়ে কর তাহলে ত আর স্বাধীন হতে চাও না? বাস্তবিক, বর পছন্দ না হলেই মেয়েরা চায় স্বাধীন হতে—কি বল ? এদেশের ছেলেগুলোর কথা আর বলো না সুনন্দা, ঘষে-মেজে না নিলে ভদ্র সমাজে তাদের বা'র করা কঠিন।'

'সে ত' আপনাকে দেখেই কতকটা বুঝতে পারা যায়।' বলিয়া সুনন্দা আর দাঁড়াইল না, কোনমতে লোকটিকে এড়াইয়া সে ফুটপাত হইতে নামিয়া আসিল, হাত তুলিয়া একখানা চলন্ত বাসকে দাঁড় করাইল এবং কোনোদিকে আর না তাকাইয়া সে হাতল্ ধরিয়া উঠিয়া পড়িল।

যাক্, নিশ্চিন্ত। সীট-এ বসিয়া সে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। বাঁচা গেল এ-যাত্রায়। ও-লোকটার জন্য ওই পথটা দিয়া আসা দিন দিন তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিতেছে। লোকটাকে দেখিলে তাহার ভয় করে, সব গোলমাল হইয়া যায়, আঘাত দিয়া কিছু বলিতেও তাহার মুখে কথা আসে না,—অথচ, নিতান্তই প্রশ্রয় পাইয়া গিয়াছে! আলাপ একটু ছিল বৈ কি, একটু ঘনিষ্ঠতাও ছিল; লোকটার চার্ম আছে, আপাত ব্যবহারটাও ভারি সুন্দর, অনেকের উপকারও করিয়া থাকে,—হাঁ, খুব শিক্ষিত লোক। কিন্তু সুনন্দা ছাড়া আর কেউ জানে না, লোকটি কী, কী ভয়ানক, মাঝে মাঝে তাহার চরিত্রের পালিশের ভিতর হইতে বন্য হিংস্র মানুষ উঁকি মারে, সাপের মতো কুটিল, শৃগালের মতো চতুর। 'এমন একদিন আসবে সুনন্দা, আমাকে দেখতেও পাবে না সেদিন।'—শ্যেনপক্ষীর মতো লোকটা তাহার দিকে তাকাইয়া একদিন হঠাৎ এই কথাটা বলিয়া ফেলিয়াছিল। থাক্, স্কুল যাইবার সময় অমন লোকের নাম মনে মনে উচ্চারণ করিবারও তাহার প্রবৃত্তি নাই।

স্কুল তাহার আসিয়া পড়িয়াছে, সে উঠিয়া পড়িল। কনডাক্টর্ চেন টানিয়া হাঁকিল, 'একদম বাঁধকে, জেনানা উৎরেগা—'

এই কথাটা শুনিলেই তাহার রাগ হয়। সে কি জেনানা? দেশের মূঢ় নারী-সাধারণের সে কি একজন? সে ত স্বচ্ছন্দেই যে-কোনো ছেলের মতো সহজে চলন্ত বাস হইতে নামিয়া পড়িতে পারে। নামে না কোনোদিন, কারণ, লোকেরা কী মনে করিবে!

বাস্তবিক, লোকের ভয়ে চুপ করিয়া না থাকিয়া সেই লোকটাকে বেশ দু'কথা শুনাইয়া দিতে পারিত। ছেলেরা যতই শিক্ষিত হোক, মেয়েদের চেয়ে তাদের কাল্‌চার কম,—নৈলে পথের মাঝখানে দাঁড়াইয়া অমন করিয়া ভদ্র মহিলার আচল লইয়া, স্কুলে পড়ানো লইয়া কেহ ঠাট্টা করিতে পারে ?

এই ত সেদিন, এই মাত্র কয়েকদিন আগে, সারকুলার রোড দিয়া আসিবার সময় একজন ছোক্‌রা তাহার পিছু লইয়াছিল। পিছু-পিছু আসিলেই যেন মেয়েদের মন জয় করা যায় ; এমন বোকা, এমন গর্দ্দভ ! কী ছিল তাহার মনের কথা, কেন এমন করিয়া কাঙালের মত অনুসরণ করে ? ছেলেদের চরিত্রের দৃঢ়তা নেই, গাঁথুনি নেই,—জঘন্য তাহাদের মন, মন্দ দিকটাই তাহাদের লক্ষ্য। আর একদিন চায়ের দোকানের ধার দিয়া আসিবার সময়, ভাবিতেও অপমানে মাথা কাটা যায়,—ভিতর হইতে একটা টেরিকাটা ছোক্‌রা তাহাকে দেখিয়া অশ্লীল গান ধরিয়া দিল। সে-গানের না আছে মাথা, না মুণ্ডু !

স্কুলের দরজায় সে আসিয়া পড়িল। ঘণ্টা বাজিয়া গিয়াছে। যে-ক্লাসে তাহার ফার্ষ্ট পিরিয়ড্, সেখানকার ছোট-ছোট মেয়েরা তাহাকে দেখিয়া চেঁচাইয়া উঠিল, 'দিদিমণি, নমোস্কার !'

'হয়েছে থামো।' বলিয়া সুনন্দা তাড়াতাড়ি হেড্ মিষ্ট্রেসের ঘরে নাম সই করিতে চলিয়া গেল।

ক্লাসে আসিয়া সে যখন ঢুকিল মেয়েগুলা তখন খানিকটা ঠাণ্ডা হইয়াছে। একটু উঁচু ক্লাসে আজকাল তাহাকে পড়াইতে হয়। অর্থাৎ ফ্রক ছাড়িয়া কোনো-কোনো মেয়ে সবে মাত্র সাড়ী পরিতে সুরু করিয়াছে। কেহ কেহ এখনই দুল পরে, মাথার চুলে ক্লিপ আঁটিয়া আসে। প্রসাধনের প্রতি মেয়েদের প্রকৃতগত পক্ষপাতিত্ব, মন তাহাদের বড় সচেতন।

রোল্‌-কল্‌ শেষ হইবার পর সবাই একে একে টাস্ক আনিয়া

দেখাইল। যাহারা দেখাইল না তাহাদের মধ্যে অণিমা একজন। মেয়েটি নতুন ভর্ত্তি হইয়াছে। লাস্ট্ বেঞ্চে বসিয়া থাকে, পড়া জিজ্ঞাসা করিলেই সে ভ্যাক্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলে। কে একটা দুর্বিনীত মেয়ে সেদিন বাড়ী হইতে এক চিম্‌টি হলুদ-বাটা আনিয়া অলক্ষ্যে তাহার কাপড়ে মাখাইয়া দিয়াছিল। উঁচু ক্লাসের একটি মেয়ে তাহার দিকে তাকাইয়া হাসিয়া বলিয়াছিল, তোর বুঝি গায়ে হলুদ হয়ে গেল রে?—অপমানে ও লজ্জায় অণিমা কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল।

নতুন পড়া বুঝাইয়া দিতেই প্রথম ঘণ্টা শেষ হইয়া গেল।

তারপর দ্বিতীয় ঘণ্টা। সুনন্দা ক্লাস হইতে বাহির হইয়া টিফিন-রুমে চলিয়া গেল। জনতিনেক লেডি-টিচার বসিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে-ছিলেন। কলিকাতায় বাড়ীওয়ালাদের পকেট ভরাইতে কেমন করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থগণ সর্ব্বস্বান্ত হয়, সলিলাদি' শয়ন-কক্ষে কি রকম রান্না-বান্না করেন, করুণাদি'র বোন-ঝির বিবাহে কে কি দিয়া মুখ দেখিয়াছে,—মেয়েটির মুখ-চোখ বেশ ভাল, ইত্যাদি। সুনন্দা আসিয়া তাঁহাদেরই অপর প্রান্তে একখানি চেয়ার টানিয়া বসিয়া টেবিলের উপর হাতের ভর দিয়া ঝুঁকিয়া পড়িল।

স্কুলের ঝি বাসায় গিয়াছিল, এইবার টিফিন-রুমে ঢুকিয়া সুনন্দাকে দেখিয়া কহিল, 'কেলাসে আপনাকে খুঁজতে গিছ্‌লাম দিদিমণি, এই একখানা চিঠি আছে আপনার।' বলিয়া একখানি পত্র বাহির করিয়া তাহার হাতে দিল।

চিঠি এমন প্রায়ই আসে লেডি-টিচারদের নামে। সুনন্দা সেখানা খুলিয়া একান্ত আগ্রহে পড়িতে লাগিল। করুণাদি' কৌতূহলী হইয়া কহিলেন, 'কাকার ওখান থেকে এলো বুঝি?'

কৌতূহল মেয়েদের চরিত্রের সব চেয়ে বড় দৌর্ব্বল্য। সুনন্দা কহিল, 'না।'

'বাড়ীর সব ভালো ত সুনন্দা ?' সুনন্দার নাম ধরিয়াই তাঁহারা ডাকেন, কারণ সে বয়সে এখানে সকলের ছোট।

সুনন্দা পুনরায় মুখ তুলিয়া কহিল, 'বাড়ীর চিঠি নয়।'

আত্মীয় বলিতে তাহার আর কেহ নাই : থাকে সে মামার বাড়ীতে ; কলিকাতাতেই মামার বাড়ী। সুতরাং চিঠিপত্র বাহিরের লোক ছাড়া আর কেহ লিখিতে পারে না। মায়াদি' একটু হাসিয়া কহিলেন, 'বন্ধুবান্ধব বুঝি ?'

'হুঁ।'

সলিলাদি চট্ করিয়া কহিলেন, 'মেয়ে-বন্ধু ত রে ? দেখিস্!'

'মেয়ে নয়।' বলিয়া উত্যক্ত হইয়া সুনন্দা উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। পাঁচ মিনিট্ লীজার্ তাহার হইয়া গিয়াছে।

তাহার পর কোনোক্রমে অঙ্ক ও বাংলা পড়াইয়া তুইটা ঘণ্টা কাটিয়া গেল, কিন্তু তাহার পর আর মন বসে না। মন না বসিলেও পড়াইতে হয়, জীবন-সংগ্রামের একটা প্রশ্ন আছে। মা নাই, দরিদ্র পিতা, ছোট-ছোট ভাইবোন। মামার বাড়ীর অবস্থাও তেমন সুবিধা নয়। কিন্তু যাক্ সে কথা। কথা হইতেছিল চিঠিখানি লইয়া। চিঠিখানির অন্তর্গত বিষয় বস্তুটা তাহাকে উৎপীড়িত করিয়া তুলিল, অস্থির করিল। ঘড়ির দিকে সুনন্দা তাকাইল। তুইটা বাজে। কি আশ্চর্য্য, এখনো তুইটা বাজে ? কাঁটা যেন আর নড়িতে চায় না ; ঘড়ি বন্ধ হইয়া যায় নাই ত ? চিঠিখানা যেন তীরের মতো আসিয়া তাহাকে বিঁধিয়াছে। শিকারী কেমন করিয়া বুঝিবে হরিণের বুকে কি যন্ত্রণা হয়! নিষ্ঠুর, পৃথিবী নিষ্ঠুর, নিষ্ঠুর জীবন-সংগ্রাম, নিষ্ঠুর বিধাতা !

'দিদিমণি, হাতী মানে এলিফ্যান্ট্ কেন ? হাতীর ত চারটে পা আছে, না দিদিমণি ?'

বিস্ফারিত বিস্ময়ে সুনন্দা তাহার দিকে তাকাইয়া রহিল ; সে

যেন কিছুই শুনিতে পায় নাই, যেন স্বপ্ন দেখিতেছে। সত্যি, স্বপ্ন দেখিতেছে সে বহুদিন ধরিয়া। স্বপ্ন দেখিয়াই তাহার দিন যায়; দিন আর রাত্রি। প্রতিদিনের বাহ্য জীবনটা তাহার কিছু নয়, প্রতি-দিনের সহিত তাহার মনের মিল নাই; নিজের কাছে সে সত্য হইয়া উঠে স্বপ্নে; স্বপ্নলোকেই তাহার আনাগোনা।

যে-মেয়েটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, সে বসিয়া পড়িল। ক্লাসে মেয়েরা গোলমাল করিতেছে—কাহার হাতের সোনার চুড়ির মূল্য লইয়া কোন একখানা বেঞ্চে বিবাদ বাধিয়াছে, কাহার খাতায় গান লেখা ধরা পড়িয়াছে,—কিন্তু সুনন্দার মনে হইতেছিল, নির্জ্জন, ভয়ানক নির্জ্জন, সে যে নিতান্তই একা। হাঁ, একা সে; বাল্যকাল হইতেই একা, বরাবর একা, কোথায় একটি তাহার গোপন দম্ভ আছে, একটি আত্মস্বাতন্ত্র্যবোধ, যাহার জন্য সে কাহাকেও গ্রাহ্য করে নাই, বশ্যতা স্বীকার করে নাই।

স্কুল হইতে বাহির হইয়া একাকী পথে নামিয়া সে আর একবার চিঠিখানা খুলিয়া পড়িল। প্রথম সম্ভাষণ হইতে নাম সই পর্য্যন্ত যেন তাহার গায়ে জ্বালা ধরাইয়া দিয়াছে। সুস্পষ্ট ভাষা, বুদ্ধিতে উজ্জ্বল বচন-বিন্যাস, পরিচ্ছন্ন বিষয়বস্তু,—কাগজে ছাপাইয়া দিলে সাহিত্যের এলাকায় আসিয়া পড়ে। কিন্তু এই পত্রের সহিত যাহার জীবন লিপ্ত, সে-ই জানে ইহার শাণিত তীক্ষ্ণতা, ইহার মার্জ্জনাহীন নির্দ্দয় প্রয়োগ। সুনন্দা ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল।

ফিরিবার সময় সে অন্য পথ ধরিয়া হাঁটিয়া আসে। কিন্তু বাসার কাছাকাছি আসিয়া সে হঠাৎ মোড় ফিরিল। এখন সে ফিরিবে না, ফিরিলেই তাহাকে শুইয়া পড়িতে হইবে। সেই জানালা, সেই আকাশ, সেই ভালো না-লাগা। শরীরে শক্তি নাই, মনে স্ফূর্ত্তি নাই,—তবু সময়ের রথের চাকা তাহাকে পিষিয়া চলিতে থাকিবে। আবার বড় রাস্তার ধারে আসিয়া সে বাস্-এর জন্য অপেক্ষা করিতে

লাগিল। তিন নম্বর বাস্। তিন নম্বর ছাড়িয়া আবার আট নম্বরে উঠিতে হইবে। দুইখানা দেখিতে দেখিতে পার হইবার পর তিন নম্বর আসিয়া দাঁড়াইল। হাতল্ ধরিয়া সুনন্দা উঠিতেই দু'একটি লোক সসম্ভ্রমে জায়গা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। নারীর প্রতি পুরুষের এই অতি-সম্মান অত্যন্ত বিসদৃশ ও দৃষ্টিকটু, কাঙালপনার উপরে যেন একটি ভদ্র আবরণ জড়ানো। স্ত্রীলোককে বড় করিয়া দেখিবার মধ্যে রহিয়াছে একটি দৈন্য, সূক্ষ্ম যৌন প্রবৃত্তির লোলুপতা, স্ত্রীলোককে ছোট করিয়া যাহারা দেখে, সেখানেও এই, না পাওয়ার আত্মগ্লানি। সুনন্দা নির্বিকার হইয়া বসিয়া রহিল। যাহারা জায়গা ছাড়িয়া দৃষ্টি-প্রসাদের আশায় দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের দিকে সে ভ্রূক্ষেপও করিল না। মোটর ছুটিতেছে। মোড়ে-মোড়ে আসিয়া থামে, সওয়ারির জন্য হাঁকাহাঁকি করে, আবার চলে। নগরীর মুখর কোলাহল, জন-স্রোত, যান-বাহনের শব্দ,—তাহাদের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া আবার চোখের সম্মুখে চিঠিখানা আসিয়া দাঁড়াইল। চিঠিতে তাহার প্রতি অকথ্য কটূক্তি, সে জঘন্য, সে কুৎসিত ; যেন পৃথিবীতে সবাই ভাল, সবার মনই যেন গেরুয়ায় ছোপানো, সকলেই নামাবলী পরা ; শুধু সে-ই খারাপ, সে-ই ইতর। তাহার চরিত্রের প্রতি অযথা মন্তব্য সে সহ্য করিতে পারিবে না। না পারিবে না, সে ইহার প্রতিবাদ করিবে, আত্মহত্যা করিয়া প্রতিবাদ করিবে। সে কি এই কথারই যোগ্য ? এই কথা শুনিবার জন্যই কি তাহাদের বন্ধুত্ব হইয়াছিল ? যাহার নকট হইতে সব চেয়ে সুমধুর কথা শুনিবার কথা, তাহারই মুখে শুনতে হয় সকলের চেয়ে যাহা অশ্রাব্য ? একেবারে নিরর্থক, একেবারে যুক্তিহীন কটূক্তি। মনে পড়ে প্রথম-প্রথমকার কথা। কত সৌজন্য, কত ভদ্রতা, কত পালিশ ; সেদিন ত জানা ছিল না ইহাদের পিছনে ছিল পুরুষের প্রকৃতির অখণ্ড বর্ব্বরতা, অলজ্জ অহঙ্কার ! নারীর চরিত্রের উপর যাহারা কথায় কথায় কটাক্ষ করে, আপন

চরিত্রের প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা নাই। কিন্তু কি করা যাইবে,—সুনন্দার মনে হইল, উহারা মানুষ, দেবতা নয়।

তিন নম্বর ছাড়িয়া আট নম্বর বাস্‌-এ সে যখন চড়িয়া বসিল, ওয়েলেসলি ও ইলিয়ট্‌ রোড দিয়া যখন মোটর চলিতে লাগিল, সুনন্দার গায়ে তখন কাঁটা দিতেছে। ভয়ে নয়,—কোথায় যেন একটি অত্যুগ্র আনন্দ স্ফুরিত হইয়া উঠিতেছিল। নারীর আত্মসম্মান কতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়, কখন সে আত্মসমর্পণ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, একথা সাধারণ মানুষ বুঝিবে কেমন করিয়া ? হাঁ, একটি অব্যক্ত আনন্দ, অসামান্য রস, অযৌক্তিক উল্লাস। বসিয়া-বসিয়াই নিঃশব্দে সুনন্দা উল্লাসে মাতিয়া উঠিল। কত সহজ সে, কতখানি স্পর্শাতুর। শরতের আকাশের মতো পরিবর্ত্তনশীল, দিনান্তের দিগন্তের মতো বহুবর্ণায়মান। সারকুলার রোড ছাড়িয়া নিউ পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া সে নামিয়া পড়িল। অনুসন্ধিৎসু চক্ষুকে সে চারিদিকে একবার প্রসারিত করিয়া দিল, এখনই যেন একটি অপূর্ব্ব আবিষ্কার করিবে ; চক্ষু তাহার পাহারা দিতেছে। হয়ত বা এই অগণ্য পথচারী-গণের মধ্যে এখনই একটি বিশেষ মানুষকে দেখা যাইতে পারে।

স্বাধীন, স্বাধীন মেয়ে সে। পায়ের নখ হইতে মাথার চুল পর্য্যন্ত তাহার স্বাধীন ; অত্যন্ত উদ্ধত ভাবে সে স্বাধীন। অপরিচিত রাজ-পথের ধারে চলিতে চলিতে কি যেন দৈবাৎ দেখিবার আশায় তাহার অবাধ্য দৃষ্টি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। অথচ কেনই বা সে আসিয়াছে, কী দরকার, কিছুই ত বলিবার নাই! অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইয়া আবার ফিরিয়া আসা, নিরর্থক যাওয়া আসা! দুর্ব্ব-লতায় মানুষকে করে ভীরু, বুদ্ধিহীন। এই অসংযত, হিসাব বুদ্ধিহীন দুর্ব্বলতা, ইহাকে রোধ করিলে অধিকতর উদ্ধত হইয়া মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়, দুঃসাহসিক দুর্ব্বলতা! কিন্তু এই চিঠিখানা,—গায়ের ব্লাউসের ভিতরে থাকিয়া যাহা বুকের উত্তাপে গরম হইয়া উঠিয়াছে ?—সুনন্দার

চোখ দুইটি ঝাপ্‌সা হইয়া আসিল। এ যে চরম অপমান বিষম লজ্জা, এ যে ঘৃণা, অবহেলা! সুনন্দা একবার থমকিয়া দাঁড়াইল। যে চিঠি সে পরম আগ্রহে ও যত্নে বহন করিতেছে তাহার ভিতর লেখা আছে, সে জঘন্য, কুৎসিত, আর চরিত্রহীন। বিদ্রোহ করিবে সে, ইহার প্রতিবাদ করিবে। বুঝাইয়া দিবে, নারীর অসচ্চরিত্রের জন্য দায়ী নারী নয়।

'এই সুনন্দা, কোথায় এসেছিস রে?'

চকিত হইয়া সুনন্দা মুখ ফিরাইল। বন্ধুকে দেখিয়া সে হাসিয়া উঠিল, কাছে গিয়া তাহার কাঁধে হাত রাখিয়া বলিল, 'এদিকে আবার কোথায় আসবো, তোর কাছেই ত যাচ্ছিলাম। ছেলে কেমন আছে?'—যাক্, সে হাঁপ্ ছাড়িয়া আজকের মতো বাঁচিয়া গেল।

মেয়েটি কহিল, 'একটু ভালো, আয়না একবার, ডাক্তারবাবুর ওখান থেকে—'

'চল্' বলিয়া সুনন্দা শৈবলিনীর হাত ধরিয়া চলিতে লাগিল।

ঔষধ ও ব্যবস্থা লইয়া ডাক্তারের ওখান হইতে ফিরিবার পথে সুনন্দা কহিল, 'কাল তুই প্রসেসনে যাস্‌নি কেন রে?'

শৈবালিনী কহিল, 'আমি ভাই ভয় করিনে, ছ মাস খেটেছি, আরও ছ' মাস না হয় জেল খেটে আসবো। কিন্তু ওঁর ভাই শরীর খারাপ, ছেলেমেয়ের বড় কষ্ট হয়...তা ছাড়া অভাবের সংসার,—তুই গিয়েছিলি?'

সুনন্দা কহিল, 'ইচ্ছে ছিল না যাবার, দূরে দূরে ছিলাম,—বিজয়াদি' নাকি আর্দ্ধেক রাস্তা পর্য্যন্ত গিয়ে পালিয়ে এসেছিল?'

শৈবলিনী কহিল, 'ইস্কুলের মেয়েদের দিয়েছিল এগিয়ে...যদি মার ধোর হয়! সরলাদি'কে জগৎবাবু যেতে দেন্‌নি, বলেছেন, এবার যদি জেল-এ যাও সরলা, তবে আমি আফিং খাবো।'

দুজনেই হাসিয়া উঠিল। হাসিল, তাহার কারণ, জেল্-এ সরলার

ইণ্টার-ভিউর কথা সকলেরই মনে আছে। অফিস-রুমে বসিয়া স্বামী-স্ত্রীর গলা ধরাধরি করিয়া কী কান্না! জেল্-গেটএর ফাঁক দিয়া তাঁহাদের বিরহ-মিলনের অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া কুমারী মেয়েরা হাসিয়া লুটাইয়া পড়িয়াছিল। বাস্তবিক, সরলার মতো মেয়ের স্বদেশী করা উচিত নয়। জেল্ কর্ত্তৃপক্ষরা হাসাহাসি করে।

কথা কহিতে কহিতে শৈবলিনী বাড়ীর দরজায় আসিয়া পড়িল। ভিতরের ঘরে কাহারা যেন কথাবার্ত্তা কহিতেছিল। সদর দরজায় একখানা প্রাইভেট্ মোটর দাঁড়াইয়া। ভিতরে ঢুকিয়া দেখা গেল, শৈবলিনীর স্বামী অফিস হইতে ফিরিয়াছেন। সুনন্দার সহিত তাঁহার নমস্কার বিনিময় হইল। তিনি কহিলেন, 'গাড়ী পাঠিয়েছেন অনুভা দেবী, আপনিও যাচ্ছেন ত?'

সুনন্দা পথের দিকে তাকাইয়া কহিল, 'তার ছেলের অন্নপ্রাশনে? আমার কিন্তু আজ একটু কাজ আছে জামাইবাবু।'

'গেলে কিন্তু অনুভা খুসি হতো।'—শৈবলিনী কহিল।

কিয়ৎক্ষণ চিন্তা করিয়া সুনন্দা কহিল, 'আজকে না, আর একদিন যাওয়া যাবে।'

গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে, সুতরাং আর দেরি করা চলে না। শৈবলিনী কাপড় ছাড়িবার জন্য পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

যথাসময়ে স্বামী-স্ত্রীতে গাড়ীতে উঠিলে সুনন্দা বিদায় লইল। খানিকক্ষণ সময় তাহার কাটিল; তাহাকে এখন অনেক দূর যাইতে হইবে। বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া গিয়া মনটা তাহার অনেকখানি হাল্কা হইয়া গিয়াছে।

যাক্, শৈবলিনী তাহাকে বাঁচাইয়া দিল, শবলিনীর নিকট সে কৃতজ্ঞ। কৃতজ্ঞ সে অনেকের কাছে; এই কৃতজ্ঞতার জন্য তাহাকে অনেকের কাছেই মাথা নীচু করিয়া থাকিতে হয়। অনেকে অপ্রিয় সত্য উক্তির দ্বারা তাহাকে বিদ্ধ করে, সে থাকে মুখ বুজিয়া,

কারণ, কোনো-না-কোনো কারণে সুনন্দা হয়ত তাহার কাছে

বাস্তবিক, কী ক্ষণভঙ্গুর সে! জ্বলিয়া উঠিতেও তাহার দেরি লাগে না, নিবিয়াও যায় সে এক মুহূর্ত্তে। সুনন্দা পথের মোড়ে আসিয়া একখানা ট্রামে উঠিল।

চিঠি লিখিয়া যে-লোকটা তাহাকে এমন করিয়া অপমান করিয়াছে, স্নেহ-ভালোবাসার মূল্য যে-লোকটা জীবনে দিতে শিখে নাই, তাহার কাছে এমন করিয়া ভিখারিণীর মতো তাহার আসা উচিত হয় নাই। যাক্, আজ একটা ভয়ানক আত্ম অপমান হইতে সে বাঁচিয়া গেল। বাঁচাইল শৈবলিনী, শৈবলিনীর নিকট সে কৃতজ্ঞ। চলন্ত ট্রামে বসিয়া সুনন্দা ভাবিতে লাগিল, তাহার জীবনজোড়া এই হঠকারিতা। একদিন বাড়ী ছাড়িয়া সে পলাইয়াছিল কিছুই না ভাবিয়া। লেখাপড়া ছাড়িয়াছিল স্কুল-কলেজগুলিকে 'গোলাম-খানা' আখ্যা দিয়া—তাহার বিচার-বুদ্ধি ছিল না, ছিল ক্ষণিক মস্তিষ্ক-উত্তেজনা, ইম্প্যল্‌স্! সে অত্যন্ত ইম্প্যল্‌সিভ্। রাজনীতিতে ঝাঁপাইয়া, পিকেটিং করিয়া, প্রসেসন্ করিয়া, ফ্ল্যাগ উড়াইয়া ও জেল্ খাটিয়া তাহার ভাল লাগে নাই, তৃপ্তি পায় নাই; যাহা কিছু সে স্পর্শ করিয়া চলিয়া আসিয়াছে, সেগুলির একটির প্রতিও তাহার মোহ নাই; কিছু একটা তুর্লভকে সে খুঁজিয়া বেড়াইয়াছে, সে খুঁজিয়াছে কিছু গভীরকে, কিছু একটা অনির্ব্বচনীয়কে।

ঘরের ভিতরে তাহার ভালো লাগে নাই,—সুনন্দা ভাবিতেছিল, —তাই বাহিরে আসিয়া সে স্বাধীনতার জন্য চীৎকার করিয়া বেড়াইয়াছে। ঘরে অসহনীয় বন্ধন, বাহিরে যন্ত্রণাদায়ক মুক্তি। আর্থিক স্বাধীনতা? অবাধ চলাফেরা?—কিন্তু তাহার ভিতরে মনের খোরাক কই?

কন্‌ডাক্‌টর্ আসিয়া টিকিট্ চাহিল।

টিকিট্ করিয়া সে আবার নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার খেয়ালই হইল না যে, ট্রান্‌স্‌ফ্যর্‌ টিকিট্ লইতে হইবে।

টার্‌মিনাসের কাছাকাছি আসিয়া সে নামিয়া পড়িল। কি একটা স্বদেশী সভা উপলক্ষ্যে হৈ চৈ করিয়া লোকজন চলিয়াছে, মেয়েরাও যাইতেছে, জেল্‌-এ পরিচিত কোনো-কোনো মেয়েকেও যাইতে দেখা গেল,—তাহাদের নেশা আজিও কাটে নাই, দেশকে স্বাধীন না করিয়া আর তাহাদের বিশ্রাম নাই,—সুনন্দা সবাইকে এড়াইয়া চলিল অন্যপথে। আজ যদি তাহাকে কেহ সভামঞ্চে দাঁড় করাইয়া দেয় তবে সে চীৎকার করিয়া ওই মেয়েদের উদ্দেশে বলিতে পারে, সব তোমাদের মিথ্যা, তোমাদের মনের কথা আমি বেশ ভালরূপেই জানি। জানি, তোমরা কী চাও।

'এদিকে কোথায় এসেছিলেন? মিটিংয়ে নাকি?'

অত্যন্ত পরিচিত কণ্ঠস্বর; হ্যাঁ, অত্যন্ত পরিচিত। মনে হইল, ছিদ্রলেশহীন রুদ্ধ কক্ষের মধ্যে একটা শব্দ যেমন বহুক্ষণ ধরিয়া চারিদিকে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হইতে থাকে, তেমনি করিয়া সেই কণ্ঠস্বর সুনন্দার দেহের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। কিন্তু সে নিমেষমাত্র। পরক্ষণেই সে মুখ ফিরাইল, এবং একটি যুবকের সর্ব্বাঙ্গে চোখ বুলাইয়া কম্পিতকণ্ঠে কহিল, 'আশা করিনি তোমার সঙ্গে দেখা হবে।'

'তুমি নয়, আপনি, এই রাস্তা।'

সুনন্দা তাহাকে ডাকিয়া কহিল, 'ওদিকে চলুন, কথা আছে। এদিকে বড় লোকজন।'

ছেলেটি তাহার পাশে-পাশে চলিতে লাগিল। সুনন্দার শরীরের সমস্ত রক্ত মুখের উপর উঠিয়া উত্তেজনায় ছুটাছুটি করিতেছিল। বলিল, 'আমি আশা করিনি, অপ্রত্যাশিত দেখা তোমা—আপনার সঙ্গে। আমি ভাবতেই পারিনি যতীনবাবু।'

যতীন কহিল, 'আমিও তাই ভাব্‌চি।'

সুনন্দার গলা বন্ধ হইয়া আসিতেছিল,—'আজ দুপুরবেলা ইস্কুলে ব'সে আপনার এই চিঠি পেলাম'—বলিয়া সে কাপড়ের ভিতর হইতে পত্রখানি বাহির করিল, পরে আবার একটা ঢোক গিলিয়া কহিল, 'এমন অপমান আমাকে আর কেউ করেনি। আমার স্বভাব-চরিত্র কুৎসিত, আমি জঘন্য, সভ্যসমাজের অযোগ্য, কিন্তু একদিন,—সেদিন আপনার মনোভাব ছিল অন্যরকম।'

তাহার চোখ দিয়া জল বাহির হইয়া আসিবার উপক্রম করিল।

যতীন কিয়ৎক্ষণ থামিল, তারপর কহিল, 'পথের মাঝখানে বেশি কথা বলা চলে না; কিন্তু আপনার কি ধারণা, আমি ভালোবেসেছিলুম আপনাকে?' বলিয়া সে একপ্রকার নির্দ্দয় হাসি হাসিল, কহিল, 'ভালো আমি কাউকে বাসিনে, ওটা নিয়ে আমি কেবল খেলা করি। যাক্‌গে,—আর একদিন কথাবার্ত্তা বলা যাবে, আমি এখন চলি।'

যতীন পা বাড়াবার উপক্রম করিতেই সুনন্দা বলিয়া উঠিল, 'আজ আপনার এমন সময় নেই যে আমার বাসা পর্য্যন্ত যান?'

'না।' যতীন কহিল, 'একা বেশ আপনি যেতে পারবেন?'—কয়েক পা সে অগ্রসর হইল, তারপর পুনরায় পিছন ফিরিয়া কহিল, 'তোমার সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব করেছিলাম সুনন্দা,—মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্বই ভালো। কিন্তু বন্ধুত্ব মানে প্রেম নয়, মনে রেখো।'

বলিয়া সে চলিয়া গেল।

তিন নম্বর বাস্‌ হইতে নামিয়া সে বাসার পথ ধরিল। তখন প্রায় সন্ধ্যা নামিয়াছে।

পথটা যেন তখনও দুলিতেছে, দু'ধারের বাড়ীগুলা যেন জীবন্ত জন্তুর মতো লাফালাফি করিয়া বেড়াইতেছে, বন্ধুত্ব মানে প্রেম নয়, তবে কী?

যাক্, এই অভিজ্ঞতাটুকু সঞ্চয় করিতে গিয়া তাহার জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৈবেদ্যটি উৎসর্গ করিতে হইয়াছে। আজ তাহার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া গেল।

'আঁচলটা একটু সাম্‌লে, সুনন্দা ; সাবধানে একটু পথ হেঁটো।'

সুনন্দা ফিরিয়া চাহিল, এ সেই সকালের সুরেশবাবু। মদ্যপান করে বলিয়া লোকটার সহিত সে আর বাক্যালাপ করিতে ইচ্ছা করে না। এবার কিন্তু সে দাঁড়াইয়া পড়িয়া কহিল, 'অসভ্যতা করেন কেন যখন-তখন ?'

'আহা, বল্‌ছি যে সব আশা তোমার এখনো মেটেনি, একটু সাম্‌লে। এটা কি আমার অসভ্যতা হোলো, সুনন্দা ?'

'আপনার উপদেশ দেবার দরকার নেই।'

অত্যন্ত বিনয় করিয়া সুরেশবাবু কহিল, 'রাগ করো না সুনন্দা, পৃথিবীতে এখনো আছে কিছু বন্ধুত্ব, কিছু ভালোবাসা—হতাশ হবার কোনো কারণ নেই !'

সুনন্দা পিছন ফিরিয়া আবার চলিতে লাগিল।
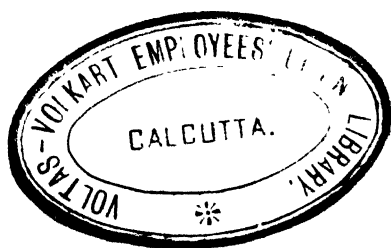
॥ চার ॥

সন্ধ্যার পরেই লগ্ন। বর আসিয়াছে বিবাহ করিতে; প্রচলিত নিয়মে বিবাহ যেমন করিয়া হয়। আসর বসিয়াছে। দামী গালিচা পাতা, আশেপাশে লাল মখ্‌মলের গোটা চারেক তাকিয়া, ছ'দিকে বড় বড় রূপার ফুলদানিতে তুইটি ফুলের তোড়া, মাথার উপরে ও দেয়ালের চারিদিকে ঝাড়ের আলো জ্বলিতেছে। বরযাত্রীতে বড় ঘরখানা ঠাসাঠাসি। ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র গোলমাল, লুচিভাজার গন্ধ, চুরুটের ধোঁয়া, ফুলের খোসবায়, গানের আওয়াজ, সুলভ রসিকতার ইঙ্গিত, অতিথি-অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়ন। ঠিক সাধারণ বিবাহ যেমন করিয়া হয়, অতি সাধারণ প্রথায়।

বরের মাথায় টেরি, কপালে চন্দন, চোখে উৎসাহ, মুখে সংযত হাসি, সর্ব্বাঙ্গে পরিপাটি প্রসাধন। সভায় প্রকাশ, ছেলেটি শিক্ষিত, বিনয়ী, রূপবান এবং ধনী—কিন্তু অত্যন্ত সাধারণ, অন্যের চোখের পছন্দে সে বিবাহ করিতে আসিয়াছে। তাহাতে তাহার বিরক্তিও নাই; এই প্রচলিত প্রথা। মনের খুসিতে ও চাপা হাসিতে বর এদিক-ওদিক তাকাইতেছিল। তাহার পাশেই ছ'তিনটি আধুনিক যুবক গান গাহিতেছে।

দরজার কপাটে হেলান্ দিয়া তাহার যে বন্ধুটি চুপ করিয়া এতক্ষণ দাঁড়াইয়াছিল, বর তাহাকে ইঙ্গিতে হাত বাড়াইয়া ডাকিল। বন্ধুটি কাছে আসিয়া বসিতেই বর হাসি-হাসি মুখে কহিল, বেশ লাগ্‌চে, না রে অমিয়?

অমিয় তাহার কথাটাকে তাচ্ছিল্য করিয়া কহিল, অত্যন্ত বিরক্তিকর কিনা, তাই তোর ভালো লাগ্‌চে।

তাই বটে, ঠিক বলেছিস্ তুই, বিরক্তিকর। সেই থেকে, একটানা ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে' চলেছে।

একটু হাসিয়া অমিয় কহিল, তাহলে' নিশ্চয় বাজে কথা বলেচি! আমি যখন বাজে কথা বলি তখন সবাই আমার প্রশংসা করে।

বর তাহার কথা বুঝিতে পারিল না। কহিল, ওখানে এতক্ষণ চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলি কেন?

দাঁড়িয়েছিলাম, হ্যাঁ—এম্নি।

চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলি? দেখ্ছিলি বুঝি কারো দিকে?

চুপ করে' দাঁড়িয়েছিলাম।

বর কহিল, গান শুন্ছিলি নাকি?

না, গান শুন্ব কেন? হ্যাঁ, গানই শুন্ছিলাম। বেশ গান।

কি করছিলি তোর মনে নেই!

অমিয় কহিল, হ্যাঁ মনে নেই, গান শুন্ছিলাম।

বর বলিল, চুরুট ধরাস্ ত নে, ঐটাতে রয়েছে। যাক্, তোর ঘট্‌কালির বাহাদুরি আছে কিন্তু, যাই বলিস্।

হ্যাঁ, চেনা মেয়ে, নিজেদের জানাশোনার মধ্যে। শ্বশুরবাড়ী কাছাকাছিই হ'ল। রোজ একবার করে' যাতায়াত চল্‌বে। বিদেশ বিভুঁয়ে না হয়ে এ বরং—

তোরই জানা মেয়ে, নিতান্ত একেবারে অচেনা নয়। আচ্ছা ঠিক বয়েসটা কত বল্ ত?

অমিয় কহিল, মেয়েদের বয়েস দেখ্‌তে নেই, দেখ্‌তে হয় বাঁধুনি,—যৌবন। তবে এর বয়েস বছর আঠারো!

আঠারো? ওরা যে বলেছে ষোল?

ওরা যে মেয়ের পক্ষ!—হ্যাঁ, এই বছর আঠারো, কিম্বা, এই ধরো দু'মাস কম। আঠারোর মতই তাকে দেখ্‌তে, ষোলও নয়, কুড়িও নয়—

সম্পূর্ণ পরিপূর্ণ আঠারো! আঠারোটি বছরকে সর্ব্বাঙ্গে সে থাকে-থাকে সাজিয়ে রেখেছে।

বর মনে মনে কৌতুক অনুভব করিয়া চুপ করিয়া রহিল। প্রশ্নের পর প্রশ্ন ফুটিয়া তাহার মাথার ভিতর ভিড় করিতে লাগিল। এক সময় কহিল, আচ্ছা, মেয়ে ত সুন্দরী তুই বলেছিস্?

নানা গোলমাল, নানা কণ্ঠের কোলাহল, সকলেই এদিকে-ওদিকে ছুটাছুটি করিতেছে। পান তামাক সরবৎ সিগারেট ও অসংলগ্ন হাসি-মস্করা চারিদিকে ছড়াছড়ি হইতেছিল। কন্যাপক্ষীয়রা অতি সন্তর্পণে অতি-ভদ্রতার মুখোস পরিয়া অতি ক্ষিপ্রতার সহিত তদ্বির করিয়া বেড়াইতেছিলেন।

অমিয় চুরুট্‌টা ধরাইয়া লইল। মুখের মধ্যে ধোঁয়া টানিয়া আবার ছাড়িয়া দিয়া বলিল, সুন্দরী!

বর বলিল, বল্‌তে গিয়ে চুপ করেছিলি কেন? খুব সুন্দুরী নয় বুঝি?

আবার চুরুটে টান্ দিল এবং আবার ধোঁয়া ছাড়িয়া অমিয় কহিল, হ্যাঁ, খুবই সুন্দুরী।

খুব নয় বোধ হয়, শুধু সুন্দরী।

হ্যাঁ শুধু সুন্দরী; সুন্দরীই শুধু। খুব বল্‌লে বোঝানো যায় না, কত।

তবু কি রকম সুন্দুরী? কা'র মতন?

কারো মত নয়। তার মত হবার যোগ্যতা কারো নেই। যে শুধু সুন্দরী, তার সঙ্গে কারো তুলনা হয় না।

তুলনাই হয় না? এত রূপ?

এত রূপ নয়, এত সৌন্দর্য্য! বিয়ে করা উচিত রূপ দেখে নয়, সৌন্দর্য্য দেখে। সত্যিকারের সৌন্দর্য্যের কোনো সত্য বর্ণনা নেই!

চোখ উজ্জ্বল করিয়া বর বলিল, মাথায় চুল আছে খুব?

দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলির দিকে অমিয় তাকাইয়া-তাকাইয়া দেখিতে লাগিল। তারপর দেখিল ঝাড়ের সব আলোগুলি ঠিকমত জ্বলিতেছে কিনা! ওপাশে বন্ধুরা তাস খেলিবার আড্ডা বসাইয়াছে। মনে হইতেছে বিবাহের লগ্নের আরও একটু দেরি আছে।

সাজা পানের কপাল হইতে একটি লবঙ্গ খুলিয়া লইয়া মুখে পুরিয়া অমিয় কহিল, হ্যাঁ, অনেক চুল! চুলের অন্ধকার! সুমুখের দিকে কোঁকড়ানো, একরাশি আংটির মত, আর পেছন দিকে অসংখ্য সাপের মত, আঁকাবাঁকা—হিল্‌হিলে! অরণ্যের মত গভীর; চুল নয়, চালচিত্র! ঘরে এসে দাঁড়ালে চুলের গন্ধে ঘুম ভেঙে যায়! সে যদি পথ হারায় তুমি তার চুলের গন্ধ অনুসরণ করে' তাকে খুঁজে পাবে। সে যদি উলঙ্গ হয়ে বসে' চুলের রাশি খুলে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকে, তবে তার কাপড় না পরলেও চলে!

গভীর মনোযোগের সহিত বর তাহার কথা শুনিতেছিল। শেষের কথায় বিস্ময় অনুভব করিয়া কহিল, মুখখানি ভাল, কি বলিস্? তুই ত কতবারই দেখেছিস্!

হ্যাঁ, অনেকবার দেখেছি, বহুবার। সে কেমন দেখ্‌তে এ কথা বহুবার তাকে দেখে ভেবেছি।

কেমন দেখ্‌তে রে?

বলা কঠিন। দেখ্‌তে সে ভাল। দেখ্‌তে সে ভাল এইজন্যে যে, পৃথিবীর আর কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে না। পৃথিবীর একটিমাত্র মেয়ে সে। চন্দ্রের চারিদিকে যেমন কোটি-কোটি তারা, তেমনি তার পাশে পৃথিবীর আর সব মেয়ে। সে মেয়ে নয়, মেয়েদের রাণী!

বর কহিল, আমি বল্‌ছি তার মুখখানি কেমন দেখ্‌তে!

অমিয় কহিল, শ্যাওলা-পড়া দিঘীতে অনেক পদ্ম ফুটে রয়েছে। তুল্‌তে তুল্‌তে হঠাৎ দেখা গেল, একটি তার মধ্যে পদ্ম নয়, সেটি

একটি মেয়ের মুখ, মুখখানির ওপর শরতের শিশির-বিন্দু। সেই মুখখানি এই মেয়ের, এই, তুমি যাকে বিয়ে করবে।

আচ্ছা, তা ত' হ'ল! মেয়ে লেখাপড়া জানে?

যথেষ্টই জানে! বিদ্বান নয়, সুশিক্ষিত!

বর কি ভাবিয়া কহিল, কিন্তু লেখাপড়া জানা মেয়ে শুনেছি তেমন—

হ্যাঁ, লেখাপড়া জানা মেয়েরা ভালবাসতে পারে না, আর নিরক্ষর মেয়েরা ভালবাসতে পারে না,—এই ওদের মধ্যে তফাৎ।

তা'হলে এ মেয়ের সঙ্গে—

এ মেয়ে বিধাতার সর্ব্বপ্রথম সু-সৃষ্টি! এর মধ্যে নিরক্ষর মেয়ের সারল্য এবং শিক্ষিতা নারীর সৌজন্য, দুই আছে। এ মেয়ের মধ্যে ভালবাসা ছাড়াও আর একটি বস্তু আছে, যা আর কোনো মেয়ের মধ্যে নেই। সে হচ্ছে প্রেম!

আচ্ছা, ভালবাসা আর প্রেমের মধ্যে কি তফাৎ?

অমিয় কহিল, ভালবাসা হচ্ছে বোঁটা, প্রেম হচ্ছে ফুল! সব বোঁটায় ভাল ফুল ফোটে না।

বর খানিকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল, মেয়েটির আচার-ব্যবহার কি রকম অমিয়?

অমিয় কহিল, হয় অত্যন্ত সরল, নয় অত্যন্ত রহস্যজনক।

রহস্যজনক?

না, সরল। মেয়েদের সবই পুরুষের চোখে রহস্যজনক লাগে। অত রহস্য আছে বলেই তত সরল।

পাশাপাশি বসিয়া দুইজনে ফিস্ ফিস্ করিয়া কথা কহিতেছিল, কথার আর তাহাদের বিরাম নাই। বর আনন্দে বসিয়া-বসিয়া পান চিবাইতেছিল। পান যে তাহার খাইতে নাই এ কথা সে তখন ভুলিয়া গেছে।

একটি কন্যাপক্ষীয়ের লোক গামছা কাঁধে ফেলিয়া কি একটা কাজে তাড়াতাড়ি চলিয়া যাইতেছিল, একজন বরযাত্রী বলিয়া উঠিল, আচ্ছা মশাই, বিয়ের লগ্নটা ঠিক ক'টার সময় বলুন ত?

লোকটি বলিয়া গেল, এই, সময় প্রায় হয়ে এল আর কি, ঘণ্টাখানেক দেরি, ন'টার পর।

ন'টার পর, অথচ বর এল সাতটার সময়। এতক্ষণ তা'হলে বসে' বসে'—অমিয়বাবু, চুপি চুপি কি গল্প করছেন বরের সঙ্গে? পাত হয়েছে কিনা দেখুন না একবার! আপনি ত কন্যেপক্ষের—

অমিয় কহিল, হ্যাঁ, এদিকে আমি মাসি, ওদিকে পিসি।

সবাই হাসিয়া উঠিল। যে লোকটি বসিয়া গান গাহিতেছিল, সে আরও উঁচুতে গলা চড়াইয়া দিল। ও-পাশে বাঁয়া-তব্‌লার চাঁটি পড়িতে লাগিল।

বালিশে হাত চাপিয়া বর কাৎ হইয়া বসিল। তারপর চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা, মেয়ের চোখ দুটি কেমন অমিয়?

অমিয় হাসিল, হাসিয়া বলিল, মেয়ে দেখে যে বিয়ে করে না তার এই দুর্দ্দশাই হয়! চোখদুটি তার অত্যন্ত সাধারণ, এত সাধারণ যে মনে হয় সে চোখ বহুবারই দেখেছি। বহু মেয়ের মধ্যে বহুবার সে চোখ দেখেছি, দেখে চিনে রেখেছি। সে চোখ এত সাধারণ এবং এত স্বাভাবিক।

বর চুপ করিয়া রহিল। মনে হইল সে যেন ভগবৎ গীতা শুনিতেছে। অমিয় বলিতে লাগিল, কোথায় তুমি সে চোখ দেখেছ তোমার মনে নেই! মনে হবে বহু জন্ম আগে থেকে তুমি ঐ চোখদুটি খুঁজে এসেছ। সে চোখের কাছে দাঁড়ালে তোমার মুখের ছায়া পড়বে তার মধ্যে। সে চোখ যেন দুই বিন্দু আকাশ।

বর মুখ তুলিয়া তাহার দিকে তাকাইল। অমিয় নিজের মনে বলিয়া চলিল, অতিরঞ্জিত নয়,—সে চোখে ইসারা-ইঙ্গিত নেই, সুন্দরী

মেয়ের স্বভাব-সুলভ ছলাকলা নেই, তা'তে আছে প্রাণের গভীরতা। সে চোখে পিপাসা নেই, আছে নিবিড় তপস্যা।

বর কহিল, তপস্যা? তা'হলে ঘর কর্‌বে কেমন করে?

অমিয় মৃদু হাসিল,—ঘর করবারই তপস্যা! তুমি যখন তাকে ভাল ক'রে চিন্‌বে, তোমার মনে হবে সে সন্ন্যাসিনী নয়, নিতান্তই গৃহবাসিনী।

খুব শান্ত বুঝি?

খুব। শান্ত এবং ধীর। ঝড় যখন ছোটে না, তখন সে বসে ধ্যান করে। এত শান্ত যে মানুষের বিস্ময় আনে। তাকে দেখ্‌লে মনেই হয় না যে এই দক্ষিণ হাওয়ার পিছনে রয়েছে প্রলয়ের ঝড়। হ্যাঁ, তুমি যখন তা'র কাছে বসবে, মনে হবে, তোমার পাশেই বিশাল বিশ্বপ্রকৃতি। এ মেয়ের সর্ব্বাঙ্গে তরুলতা, ফুল-ফল, বন-প্রান্তর, গিরি-গহ্বর, অরণ্যের শ্যামশোভা, অপরিমাণ আকাশ,—সূর্য্য-চন্দ্র, গ্রহ-নক্ষত্র। তোমার শরীর হবে রোমাঞ্চ, আবেগে আন্দোলিত হবে তোমার সর্ব্বদেহ, তোমার স্তব করতে ইচ্ছে হবে।

স্তব করতে? ভালবাসতে নয়?

ভালবাসতে এবং স্তব কর্‌তে। ভালবেসেই তুমি তৃপ্ত হবে, ভালবাসা পেয়ে নয়।

বর কহিল, সে কি রে? সে ভালবাসবে না? ভালই যদি না বাসবে তাহলে এত কাণ্ড করে'—?

অমিয় বলিল, এক একটি মেয়ে থাকে, তারা ভালবাসতে আসে না, ভালবাসা পেতে আসে। তুমি তাকে স্ত্রী বলে' পরিচয় দেবে এই তোমার পরম ঐশ্বর্য্য! মেয়েরা ত ভালবাসে না, তোমাদের ভালবাসায় তারা মুগ্ধ হয়, এই মাত্র। মেয়েদের আসক্তিকে প্রেম বল্‌লে সব পুরুষই সন্ন্যাসী হয়ে যেত'। মেয়েরা পূজায় তুষ্ট হয়, তাই তাদের নাম—দেবী। তুমি দেবে পূজা, সে দেবে প্রসাদ।

এ মেয়েটি কেমন ?

কেমন—এই কথাটাই ত তোমাকে আবিষ্কার করতে হবে ! এ মেয়েটি তোমার মুখের দিকে যখন মুখ তুলে তাকাবে, তোমার মনে হবে তুমি জীবনে অনেক অন্যায় ও অনেক পাপ করেছ। মনে হবে তুমি অত্যন্ত দুর্ব্বল, ভীরু, অসহায়। এমন একটা চোখের দৃষ্টি, যাতে তোমার মনে হবে তুমি অতিশয় ক্ষুদ্র, তুচ্ছ, তুমি তার পায়ের কাছে বসবারও যোগ্য নও। এর কাছে এলেই তুমি বারে বারে নিজের দৈন্য অনুভব করবে।

চুপি চুপি বর কহিল, এ কথা তোমার বুঝতে পারলাম না অমিয়।

বুঝতে পারবে, প্রথম যখন তোমার সঙ্গে দেখা হবে। বুঝবে তুমি কী। তোমার প্রতি রোমকূপ থেকে তোমার সব লজ্জা ফুটে বেরোবে, তোমার যত পঙ্গুতা, যত গ্লানি,—তা'র চোখের দৃষ্টিতে হবে তোমার শুদ্ধি, তোমার নবজন্ম। তুমি যদি সারাজীবন ধরে' দুঃখ পেয়ে থাকো, এর কাছে বসে' তুমি সকল দুঃখের কৈফিয়ৎ পাবে, সকল বেদনার। এ মেয়ে তোমার কাছে হবে বিস্ময় !

বিস্ময় ?

হ্যাঁ, বিস্ময় ! বিস্ময় আর বিচিত্র ! নারীজাতি বহুদিন ধরে' তপস্যা করেছে একটি নারীর জন্য ; সে এই মেয়েটি। শ্রাবণের আকাশ আপন অন্তর্বেদনায় কালো হয়ে উঠেছিল, সেই প্রসব-বেদনায় ফুটল একটি কেয়াফুল !

বর যেন তাহার কথাগুলির মধ্যে একটি সুস্বাদ গ্রহণ করিতেছিল। বলিল, যাক্ তোকে বহু ধন্যবাদ, তোর জন্যেই এ মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হওয়া সম্ভব হ'ল। তোর সঙ্গে পরিচয় ছিল বলেই ত—আচ্ছা, আমাকেও ত চিনিস্, বেশ বনিবনা হবে ত আমার সঙ্গে ?

অমিয় প্রথমে কথার উত্তর দিল না। সমস্ত কোলাহলের মাঝখানে

বসিয়া একা তাহার মন কোথায় যেন উধাও হইয়া ছুটিয়াছিল। যেদিকে তাকাইয়া ছিল সেদিকে তাহার দৃষ্টি ছিল না। মৃদুস্বরে বলিল, বনিবনা তোমার সঙ্গে নাও হতে পারে!

বিস্মিত হইবার পর কহিল, সে কিরে?

হ্যাঁ, এর অহঙ্কার একটু বেশী।

অহঙ্কার? সর্ব্বনাশ—

অহঙ্কার সুন্দরী বলে' নয়, সুন্দর বলে। অহঙ্কার এর কলঙ্ক নয়, অলঙ্কার। কোথাও মাথা হেঁট করে না, তার কারণ এর আছে গভীর আত্মবিশ্বাস। আত্মবিশ্বাসই এর অহঙ্কার। তোমার স্ত্রী হবে, কিন্তু তোমার কাছে ছোট হবে না। তুমি যদি তা'র সমান না হতে পারো, অনায়াসে সে তোমাকে ছাড়িয়ে যাবে। জীবনে সে কিছুর জন্যই অপেক্ষা করেনি। প্রেমের জন্য নয়, ঐশ্বর্য্যের জন্য নয়, সংসারের জন্যও নয়।

স্বাধীন মেয়ে নাকি?

স্বাধীন নয়, সহজ। সহজ হতে পারাই তার মন্ত্র!—চুরুটে আর একটা টান দিয়া ধোঁয়া ছাড়িয়া অমিয় কহিল, তোমার সঙ্গে যখন প্রথম আলাপ হবে, বুঝ্‌বে, সে নিতান্ত নারী নয়!

নারী নয়, মানে?

মানে তার মেয়েলিপনা কম। নারীর স্বার্থপরতা তার মধ্যে নেই; ছোট লোভ, তুচ্ছ ঈর্ষা, ক্ষুদ্র হিংসা, ছলনা ও লালসার ছোট-ছোট ইঙ্গিত—এগুলো তার কাছে স্বপ্ন। এগুলো সে জয় করেছে তা নয়, এগুলোকে সে আনতে ভুলে গেছে। আনতে ভুলে গেছে বলেই তার এত অহঙ্কার।

বর বলিল, এই যদি সত্যি হয় তবে সে ত কাদার পুতুল। প্রাণহীন মাটির মূর্ত্তি। তার গায়ে মানুষের রক্ত কোথায়?

অমিয় হাসিল। হাসিয়া কহিল, সাধারণ নরনারীর দেহে আছে

দুই রক্ত, মানুষের আর জানোয়ারের। এর শিরায় আছে শুধুই মানুষের রক্ত। এ মেয়ে হচ্ছে দেবতার আসন।

খুব তেজ আছে নাকি ?

তেজ নয়, জ্যোতিঃ। দিনের আলোতেও তুমি দেখ্‌বে তা'র চারিদিক ঘিরে জ্যোতির্ম্মণ্ডল। সেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলের কাছে বসলে মাথার মধ্যে তোমার প্রলাপ জমে' উঠ্‌বে। আনন্দে তুমি হবে অস্থির, তোমার হাসি পাবে, কিন্তু কান্নায় গলা বুজে আসবে; আরামের অসহ্য ব্যথায় তোমার সর্ব্বশরীর থরথর করে কাঁপ্‌বে। তোমায় মাতাল করবে না, কিন্তু বিভ্রান্ত করবে। তৃপ্তিতে অচেতন হবে, ঘুম পাবে।

বর কহিল, সে ত মোহ!

মোহ নয়, মোহমুক্তি।

একটু অস্বস্তি বোধ করিয়া বর বলিল, এ অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হচ্ছে অমিয়। তা'র আসল পরিচয়টা চেপে রেখে তুমি অনর্থক ধোঁয়ার সৃষ্টি করছ। আচ্ছা, সে কি ভালবাসে বল দেখি ?

অমিয় বলিল, সে ভালবাসে অশোক আর শিমুল ফুল, রক্ত, সিঁদুর, আল্‌তা, সূর্য্যাস্তের আকাশ, আগুনের আভা, রেলপথের বিপদসূচক আলো।

দুইজনে কিয়ৎক্ষণ নির্ব্বাক হইয়া রহিল। বর এক সময় তাহার হাতঘড়িটা ফিরাইয়া সময় দেখিয়া লইল। অমিয় আপন মনে মৃদু-স্বরে বলিতে লাগিল, সব চেয়ে কঠিন...সব চেয়ে কঠিন তুমি যখন তাকে ভালবাসার কথা বল্‌তে যাবে। মনে হবে তাকে ভালবাসা জানাবার ভাষা তোমার হাতে নেই, তুমি একেবারে দেউলে হয়ে গেছ। তুমি অনেক কথা ভেবে তার কাছে বসবে, কিন্তু কিছুই বলা হবে না। তুমি যত বড় ঐশ্বর্য্যশালীই হও, তার কাছে মনে হবে তুমি ভিখারী। সব চেয়ে কঠিন তাকে ভালবাসা জানানো, সত্যি, সব চেয়ে কঠিন।

অমিয় চাপিয়া চাপিয়া অলক্ষ্যে একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। তারপর বলিল, যত দিন যাবে ততই তুমি তার কাছে ছোট হতে থাকবে। একদিন তুমি তার নাগাল পাবে না···তুমি তার পায়ের তলায় আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা, তুমি চীৎকার করতে পাবে না, কাঁদতে পাবে না, তোমার পালাবার শক্তি নেই, তোমার টুঁটি টিপে ধরেছে, তুমি ক্লিষ্ট, ক্লান্ত··· নিজের কাঙালপনায় তোমার চোখে জল আসবে। মনে হবে জন্ম জন্ম ধরে' ছায়ার মত ওর পেছনে-পেছনে তুমি ঘুরছ, অনাগত বহু জীবন ধরেও তোমাকে ওর অনুসরণ করতে হবে।

তাকে ভালবাসতে গিয়ে এই হবে আমার শাস্তি?

একটা অতি উগ্র আনন্দ অনুভব করিয়া অমিয় বলিল, হ্যাঁ, এই শাস্তি। এই শাস্তিই পুরুষের প্রেম!

বর কথা কহিল না। অমিয় একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বলিতে লাগিল, প্রতিদিন তুমি আয়োজন করবে একটি কথা বলবার জন্য, 'তোমায় ভালবাসি'—প্রতিদিন চূর্ণ হবে তোমার সে স্বপ্ন। ভালবাসার কথা শোনবার আগ্রহ যার আছে কিনা তুমি বুঝতে পারবে না, তাকে ভালবাসা জানাবার মত সাহস তোমার হবে কেমন করে? সে যে-ঘরে থাকবে, আপন অস্থিরতায় তুমি সে-ঘরে টেঁক্‌তে পারবে না, তোমার দম্‌ আট্‌কে আসবে। তোমার কেবলই মনে হবে এ মেয়ে সঙ্গীহীন, নিরন্তর কি একটা অনির্দ্দিষ্ট বস্তুর জন্য ধ্যান করছে! তোমার কাছে কেবলই সে জটিল হ'তে জটিলতর হ'তে থাকবে।

বর কহিল, এমন মেয়েকে তা হ'লে বিয়ে করা উচিত নয়, তাই না?

অমিয় হাসিল। তারপর গভীর কণ্ঠে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, তোমার মনে হবে বিয়ে করে তার কোনো পরিবর্ত্তন হয়নি। পরিবর্ত্তন হয় তার ভেতর থেকে, বাইরের অবস্থা থেকে নয়। হৃদয়টা তার পুরুষের, মাথার ভেতরটা তার তীক্ষ্নবুদ্ধিশালী, পুরুষের মত তার

প্রতিভা, বীরের মত তার সাহস ও শক্তি, কিন্তু তবু সে মেয়ে। সেই গোপন মেয়েটি তার ভেতরে যে কোন্ গহনে বাস করছে, তাই আবিষ্কার করাই হবে তোমার সাধনা, তোমার প্রেম! নৈলে তাকে ভালবাসি—এ কথা বল্‌তে গেলেই সে হেসে উঠ্‌বে, তার কারণ সে নারী নয়। সে নারী নয়, এই কাঁটাই বার বার ফুটে ফুটে তোমায় ক্ষতবিক্ষত করবে, যাতনায় তোমাকে জর্জ্জরিত করবে, বেদনায় তোমার জীবন হবে দুর্ব্বিসহ, দেহে আর মনে এমন জ্বালা ধরবে যে মনে হবে, তোমার শরীরের সমস্ত রক্ত নিঃশেষে বা'র করে দিলে তুমি শান্তি পাও। তোমার মনে হবে—

বর বলিল, যথেষ্ট হয়েছে, আর আমি শুন্‌তে চাইনে।—বলিয়া পরম আগ্রহ ভরে সে বক্তার মুখের কাছে মুখ সরাইয়া আনিল।

ভিতরের অনুপ্রেরণায় ও আবেগে অমিয়র চোখ দুইটা জ্বালা করিতেছিল। তাহার চোখের ভিতর তাকাইলে মনে হইত, চোখের ধারগুলি তাহার সজল হইয়া আসিয়াছে। সে বলিল, কেবলই তোমার মনে হবে সে নিষ্ঠুর, তার হৃদয় নেই, ভেতরটা তার মরুভূমি, তোমার প্রতি সে উদাসীন; তোমার মধ্যে যখন ঝড় বইছে, তা'র তখন সময় হ'ল ছবি দেখ্‌বার। এবং সব চেয়ে কঠিন পরীক্ষা তোমার, সে যখন তোমাকে ভুলে থাকবে।

ভুলে থাকবে? স্বামীকে?

হ্যাঁ, ভুলে থাকবে এবং ভুলেও তোমার খোঁজ নেবে না। চোখের আড়ালে তুমি গেলেই মনের মঞ্চে সে যবনিকা ফেলে দিল। তোমার প্রতি তা'র অবজ্ঞা নয়, বিতৃষ্ণা নয়—এই তার রূপ!

স্বামীর প্রতি এই ব্যবহার করবে?

স্বামীর প্রতি নয়, তোমার প্রতি। স্বামী তার কেউ নয়। হ্যাঁ, রাত্রে তোমার হবে কণ্টকশয্যা। ঘুমের ঘোরে তুমি শিউরে উঠ্‌বে, দুঃস্বপ্নের ভয়ে তুমি অস্থির হয়ে পায়চারি করে বেড়াবে। শত শত

কঠিন বাহু দিয়ে কে যেন তোমাকে বাঁধবে, তুমি চীৎকার করতে যাবে, পারবে না, তুমি শক্তিহীন, নিঃশ্বাস নেবার হাওয়া তোমার ফুরিয়ে যাবে, সমস্ত শরীর তোমার পক্ষাঘাতগ্রস্ত।

বর উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া কহিল, আর আমি শুনতে চাইনে ভাই, তুই চুপ কর্ অমিয়।—বলিয়া সে একবার ঘড়িটা দেখিয়া লইল।

অমিয় চুপ করিল না, মুখখানা আরও সরাইয়া আনিয়া বলিতে লাগিল, ভাঙা খেল্‌নার মত যদি কেউ তা'র কাছে গড়াগড়ি যায়, সে ফিরেও তাকায় না। নিজের মাথা তোমার চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেল্‌তে ইচ্ছে হবে, মনে হবে, এ প্রবঞ্চনা, এ অন্যায়,—বিধাতার বিরুদ্ধে তোমার যুদ্ধ ঘোষণা করতে ইচ্ছে হবে, আকাশ তোমার চোখে হবে বিষাক্ত, জীবন তোমার কাছে হবে ভয়াবহ বিদ্রূপের মত···একটিমাত্র নারীর জন্য তোমার চোখে পৃথিবীর সমস্ত সৃষ্টি ওলোট-পালোট হয়ে যাবে। অথচ এই দুঃখের মধ্যেও তোমার ভেতরে জ্বল্‌বে আনন্দের অগ্নিশিখা। দুঃখের পাত্র থেকে আনন্দ পান করবে অঞ্জলী ভরে। তা'র জন্য দুঃখ পেতেও তোমার ভাল লাগবে। একদিন সেই তোমাকে—বলিতে বলিতে গলা ধরিয়া আসিতেই সে হঠাৎ সচেতন হইয়া মুখ সরাইয়া লইল। বর তাহাকে এতক্ষণ ধরিয়া সন্দেহ করিতেছে নাকি ?

ভয়ে তাহার সর্ব্বশরীর অবশ হইয়া আসিতেই সে আর বসিল না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে চলিয়া গেল।

এমন সময় আসরে একটা সোরগোল উঠিল। অন্য পক্ষের একটি লোক আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, দয়া করে উঠুন আপনারা, লগ্ন হয়ে এসেছে।

একসঙ্গে সবাই উঠিয়া হুড়োহুড়ি করিয়া ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। বরকে লইয়া গেল সর্ব্বাগ্রে।

বাহিরের নির্জ্জনে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া অমিয় একবার রাত্রির

আকাশের দিকে তাকাইল। দুই দিকে বড় বড় বাড়ীর মাঝখান দিয়া সে-আকাশ সামান্যই দেখা গেল। তারপর মুখ ফিরাইয়া কাছে একটা বাড়ীর রোয়াকে উঠিয়া সে পা ঝুলাইয়া বসিল। পকেট হইতে চুরুট ও দেশালাই বাহির করিয়া সে অন্ধকারে ধরাইতে গেল, কিন্তু পারিল না, দুইটা হাত তখনও তাহার ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতে-ছিল। বর কি তাহাকে সত্যই সন্দেহ করিয়াছে? এমন কী সে বলিয়া ফেলিয়াছে যাহাতে তাহার প্রতি সন্দেহ আসিতে পারে?

বার বার অমিয় শুধু এই কথাই ভাবিতে লাগিল।

॥ পাঁচ ॥

কত গল্পই তোমরা শোনালে, খুসি হ'য়ে শুনে গেলাম। কোনোটায় রস, কোনোটায় তত্ত্ব। জীবনকে জান্‌বার আগ্রহ তোমাদের প্রবল, তোমরা চেয়েচ মানব-চরিত্রের সকল রহস্যকে উদ্‌ঘাটিত কর্‌তে।

একখানি পেসেঞ্জার ট্রেণের একটি তৃতীয় শ্রেণীর কাম্‌রায় বসিয়া প্রায়-বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক এই কথাগুলি বলিয়া তাঁহার সঙ্গীদের মুখের দিকে তাকাইলেন। সঙ্গীরা সবাই যুবক, সম্ভবতঃ পূজার অবকাশে কন্‌সেসন্ টিকেট্ লইয়া তাহারা পশ্চিমে বাহির হইয়াছিল। ফিরিবার পথে মাত্র ঘণ্টা দুই আগে এই বৃদ্ধের সহিত তাহাদের পরিচয় ও আলাপ। ভদ্রলোকটির বয়স পঞ্চাশ কি ষাট—তাহা কাঁচাপাঁকা চুল দেখিয়া সহজে ঠাহর করিবার উপায় নাই। মধ্যপথে কখন্ তিনি উঠিয়াছেন, কখন্ পাশে আসিয়া বসিয়া ছোক্‌রাদের গল্প শুনিতে সুরু করিয়াছেন, অথচ এতক্ষণ কোনো চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন নাই—কখন্ এবং কোথায় তিনি নামিবেন, তাহাও ইহাদের অজ্ঞাত।

ছেলেরা কহিল, আপনি এমনিই নিঃশব্দে শুন্‌ছিলেন যে, আমরা ভাব্‌ছিলাম আপনি ঘুমোচ্ছিলেন এতক্ষণ, বলিয়া তাহারা হাসিল। পুনরায় কহিল, এতটা পথ যেতে হবে, আমরা চারজনে বাজি রেখেচি —কে ক'টা গল্প শোনাতে পারে। আমাদের বিষয়বস্তুটা হচ্চে মানুষের দুর্ব্বোধ্য দিকটার প্রতি ইঙ্গিত করা।

—দুর্ব্বোধ্য যদি হয় তবে তার কোন ইঙ্গিত নেই। আমি বলি ওটা দুর্জ্ঞেয়। এই বলিয়া ভদ্রলোকটি সুরু করিলেন, মানুষ ত নিজেই সৃষ্টির এই অনন্ত মহাকাব্যের এক একটি 'সিম্‌বল্', তাদের চরিত্রকে ছুঁয়ে বিশ্বের বিপুল বিস্তৃতিকে আমরা অনুভব করি। রূপের

পারে রস, কথার পারে ব্যঞ্জনা, ফুলের পারে যেমন গন্ধ। কিন্তু আমি তোমাদের যে-গল্পটি শোনাবো সেটি অত্যন্ত সাদাসিধে, সরল এবং সহজবোধ্য। মনস্তত্ত্বের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা অথবা মানব-চরিত্রের দুর্জ্ঞেয় রহস্য—এ দুটোর কোনো স্তরেই তাকে ফেলা চলে না।

রাত্রির অন্ধকারে চলন্ত ট্রেণের মধ্যে বসিয়া চার জোড়া কৌতূহল-ময় দৃষ্টির সম্মুখে ভদ্রলোক তাঁহার গল্প ফাঁদিলেন।

* *

শোন ঃ প্রায় পঁচিশ বছর আগের কথা। তখনো আমার জীবনে অভিজ্ঞতা আহরণের পালা চলেচে, চোখে তখনো নিবিড় কৌতূহলের রঙ মাখানো, সঞ্চিত জ্ঞানের গর্ব্বে তখনো পৃথিবীকে করুণা কর্‌তে শিখি নি। সেদিনো এমনি ট্রেণে চলেছিলাম। পথে বার দুই গাড়ী বদল কর্‌তে হয়। বেলা অপরাহ্ণ ; প্রান্তরের পারে অস্তগামী সূর্য্যের কিরণে দিনান্তকালের আকাশ রঙীন হ'য়ে এসেচে। কি-একটা ষ্টেশনে গাড়ী এসে থাম্‌ল। যাত্রীর ভিড় খুব, ভিতরে গোলমাল চল্‌চে, বাইরে নানা কণ্ঠের আন্দোলনে সমস্ত ষ্টেশনটা তখন মুখরিত। ট্রেণ অল্পক্ষণই থাম্‌বে। এমন সময় শোনা গেল বাইরে একটা হৈ চৈ। ভিড় পার হ'য়ে গাড়ী থেকে নেমে সমস্তটা জান্‌বার চেষ্টা আমার ছিল না, কেবল বোঝা গেল প্লাট্‌ফরমের ভিড়ে একটি ভদ্রমহিলা ও একটি যুবক ব্যাকুল হ'য়ে কাকে যেন খোঁজাখুঁজি কর্‌চেন ; প্রত্যেক কাম্‌রার দরজায়-দরজায় তাঁরা মাথা কুটে ফির্‌চেন, কি-একটা নাম ধ'রে সমস্ত ষ্টেশনে তাঁরা হাঁকাহাঁকি কর্‌চেন। সাপ যেমন হারায় মাথার মণি, চক্রবাক যেমন খোঁজে তার সাথীকে, বন্য জন্তু যেমন পাগল হ'য়ে ফেরে তার হৃতশাবকের অন্বেষণে—সে কি তোমাদের জানা আছে ? আমিও স্থাণুর মতো ব'সে আত্মীয়ের জন্য আত্মীয়ের এই ব্যাকুলতার দিকে নির্ব্বাক হ'য়ে চেয়ে রইলাম। বাঁশী বাজিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল।

গাড়ী চল্‌চে। অপরাহ্ণ গেল গোধূলিতে, গোধূলি গেল সন্ধ্যায়।

একটা অস্ফুট কোলাহল শুনে মুখ ফিরিয়ে দেখি একখানা বেঞ্চির তলায় মালপত্রের ঘিঞ্জির ভিতর থেকে একটি যুবতী মেয়ে অতিকষ্টে বেরিয়ে আস্‌বার চেষ্টা করচে। গাড়ীর ভিতরে পশ্চিমা এবং মুসলমানের সংখ্যাই বেশি। তাদের কারো পা, কারো হাত, কারো বা জিনিসপত্র নির্ব্বিবাদে ঠেলেঠুলে সরিয়ে মেয়েটি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। তার এই রহস্যময় আত্মগোপন, এই চৌর্য্যবৃত্তি ও দুরন্তপনা দেখে অনেকেই চঞ্চল হ'য়ে তাকে নানা প্রশ্ন কর্‌তে লাগ্‌লো। বয়সটা তার ভাল নয়, চেয়ারাটা তার নিরাপদে চল্‌বার মতোও নয়। উঠে দাঁড়াতেই আমার প্রথম চোখে পড়্‌লো তার পরণে একখানা সরুপাড় ধুতি এবং মাথায় রাশীকৃত চুলের মাঝখানে চওড়া সিঁদুরের দাগ, যেন নববর্ষার ঘনায়মান আকাশ বিদ্যুৎবহ্নি-শিখায় দ্বিখণ্ডিত হয়েচে। কোনো প্রশ্ন ও কোলাহলের দিকেই সে ভ্রূক্ষেপ কর্‌লো না, সমস্ত গাড়ীর ভিতরটায় চেয়ে চেয়ে একসময়ে হেসে হঠাৎ আমাকেই তার কথা কইবার মানুষ বেছে নিল। বল্‌লে, 'ওরা চ'লে গেছে জানেন? মা আর দাদা?'

বিস্ময়ে অভিভূত হ'য়ে পড়েছিলাম, ঢোক গিলে কি-একটা উত্তর দেবার আগেই বেঞ্চের উপর দিয়ে টপ্‌কে মেয়েটি কাছে এসে বস্‌লো। হাতের মধ্যে ছিল সামান্য একটি বিছানা। গাড়ীর যাত্রীরা ভাব্‌লো আমি বুঝি বা তার পরিচিত মানুষ, নানা জটলা ও কানা-কানি ক'রে এক সময় তারা নিরস্ত হলো।

'এত দেশ পালিয়ে-পালিয়ে ঘুরেচি তবু ওদের বিশ্বাস, এক্‌লা বেরুলে পথে-ঘাটে আমার বিপদ ঘট্‌বে,—কিছুতেই ছাড়্‌তে চায় না। সরুন, বিছানাটা পেতে বসি।'

অতি চঞ্চল তার চোখের চাহনি, কিন্তু সে-চাহনি কোনো চটুল-স্বভাবা নারীর নয়, সে-চাহনি আধ-পাগলের মতো অস্থির। বিছানা পেতে নিশ্চিন্ত হ'য়ে ব'সে সে এক হাতে মুখের উপর থেকে চুলগুলি

সরিয়ে দিল। বার বার মুখের উপর থেকে বাঁ-হাতে চুল সরিয়ে দেওয়া তার একটা মুদ্রাদোষ। বল্‌লাম, 'টিকিট্ করেচেন?'

'কর্‌লেই হবে এক সময়, আমি ত আর ফাঁকি দেবো না, কাছে অনেক টাকা আছে। হাতে এই বালা, গলায় রয়েচে হার, ভাবনা কি? তা' ছাড়া সব দেশের ষ্টেশন্-মাষ্টাররা আমাকে চেনে।' ব'লে সে একবার হাস্‌লো।

পরম সুন্দরী নয়, কিন্তু সে-রূপের চারিদিকে ছিল একটি অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির্ম্মণ্ডল, তার ভিতরে সাধারণের প্রবেশ-নিষেধ। আপন ইচ্ছায় দুনিয়াকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায় এমন মেয়ে তোমরা দেখেচ? তার মাথার সেই চওড়া সিঁদুরের দাগ শুধু যে সম্ভ্রম জায়গায় তা' নয়, মানুষকে তার কাছে অবনত করে, মনে মনে কেমন একটি ভয় এনে দেয়! তার চোখের উপরে চোখ রাখা যায় না।

এক সময় জিজ্ঞেস কর্‌লাম, 'কতদূরে যাবেন?'

'ঠিক নেই, দেখি না গাড়ীখানা কোন্ দিকে যায়। আপনি যাবেন কোথায়?'

বল্‌লাম, 'গৈবিনাথ হ'য়ে যাবো—'

'গৈবিনাথ? ও, এই সময়ই ত সেখানে মেলা বসে,—চলুন, ওই দিকে যাওয়া যাক্। হাঁটাপথ কিন্তু, হাঁট্‌তে পার্‌বেন, কষ্ট হবে না? পথে ভাল খাবার-দাবারও পাওয়া যায় না, ভারি বিশ্রী লাগে।'

কথা বলার এই বে-পরোয়া ভঙ্গী দেখে আমি আড়ষ্ট হ'য়ে বসেছিলাম। এ-পাগলের সঙ্গে কি কথা বলা চলে? মনে হচ্চে যদি কোথাও মতের মিল না হয়, তা' হ'লে এখুনি অপমান করতেও এ-মেয়ে হয়ত দ্বিধা করবে না। উজ্জ্বল চক্ষু, সুন্দর মুখশ্রী, স্নেহ-লেশ-হীন রুক্ষ রূপ, বলিষ্ঠ দেহ—পাথর কেটে বিধাতা গড়েচেন সে-দেহ। মুখ তুলে তার সঙ্গে কথা কইতে গেলে মুখে একটি ভীরুতা ফুটে ওঠে।

সকল কথা আজ তোমাদের বলতে পারবো না, পুঙ্খানুপুঙ্খ মনেও নেই, শুধু আছে স্মৃতি। চিত্রটা নেই, কেবল আছে রঙ,—জলে ধোয়া রঙ। বলিয়া ভদ্রলোক একটু থামিলেন। নস্য বাহির করিয়া নাকে লইয়া পুনরায় কহিলেন, ইসলাম্‌পুরের ঘাটে এসে গাড়ী থাম্‌লো। হ্যাঁ, বল্‌তে ভুলেছি মেয়েটির নাম চারুবালা। তাঁর নাম যে চারুবালা একথা সে কথায়-কথায় অন্তত পঁচিশ বার আমাকে জানালো। গাড়ী থেকে নেমে আমাকেই সে পথ দেখিয়ে যাত্রীশালায় নিয়ে এল। অনেক স্ত্রী-পুরুষ জমেচে। রাত কাটিয়ে সকালে উঠে সবাই ধরবে ষ্টীমার; সকলেরই গতি গৈবিনাথের মেলার দিকে। লোকজনের হাত-পা মাড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে, এঁকে বেঁকে যাত্রীশালার একান্তে একটু নির্জ্জন জায়গায় সে এসে থাম্‌লো। এ যেন তার অভ্যাস,—সমস্তটাই তার পরিচিত। নিঃশব্দে তার বিলি-ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমার আর গত্যন্তর ছিল না। আমি তখন কেবলমাত্র অভিভূতই নয়, আপন ব্যক্তিত্বকেও হারিয়ে ফেলেচি। হারাবারই কথা; সেই রাত, আশে পাশে সেই সূচীভেদ্য অন্ধকার, যাত্রী-শালার সেই ক্রমবিলীয়মান কলরব, স্তিমিত আলো—তাদের মাঝখানে এসে সেই অজ্ঞাতকুলশীলা রহস্যময়ী সুন্দরীর অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ... জানিনে এরকম ঘটনা তোমাদের জীবনে ঘটেচে কি না।

'জায়গাটা রাখ্‌বেন, আমি আস্‌চি।' এই ব'লে হাতের বিছানাটি আমার জিম্মায় রেখে চারুবালা একবার অদৃশ্য হ'ল। কী অক্লান্ত সে, কী তার উদ্যম! ফিরে যখন এল, তার হাতে একরাশি খাবার। নিঃসঙ্কোচে দু'ভাগ কর্‌লো, এক ভাগ দিল আমার দিকে এগিয়ে।

'ওই যা, জল আনা হয় নি! দিন্ দেখি আপনার কমণ্ডলুটা?'

দেবার অপেক্ষা সে রাখ্‌লো না, হাত বাড়িয়ে কমণ্ডলুটা নিয়ে সে আবার জল আন্‌তে ছুট্‌লো। জল এনে রেখে পরিস্কার সহজ কণ্ঠে বল্‌লে, 'খাবারের দরুণ তিন আনা আপনি আমাকে দেবেন।'—

কোনো সঙ্কোচ, কোনো অকারণ চক্ষুলজ্জা এবং সামাজিক সৌজন্য তার নেই।

সে-রাত কাট্‌লো। ভেবেছিলাম একটু আলাপ করব, তার কথা জান্‌বো, তার এই বাধাবন্ধনহীন জীবনের আসল কথাটা শুনে নেবো, কিন্তু সুযোগ পেলাম না। স্বামিত্যাগিনী মেয়েটি সেই-যে বিছানা পেতে শুয়ে চোখ্‌ বুজ্‌লো, আর জাগ্‌লো না, নিশ্চিন্ত নির্ভয়তায় পাশে শুয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই তার নাক ডেকে উঠ্‌লো।

প্রভাতে ষ্টীমার ছেড়ে বেলা ন'টা আন্দাজ পারের ঘাটে এসে লাগ্‌লো। মাঝখানে চারুবালা একবার অদৃশ্য হলো, ষ্টীমারে কোথাও তাকে খুঁজে না পেয়ে ঘাটে নেমে এলাম। ঘাটে এসেও প্রথমটা পাই নি। তবে কি চলে গেছে? ব্যাকুল চোখে চারিদিকে হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে ফির্‌ছি এমন সময় দেখ্‌লাম, স্নান সেরে ঘাটের ধারে সে জপে বসেছে। সে কী জপ, যেন সে পাথর হ'য়ে গেচে! কতক্ষণ পরে তার জপ শেষ হলো। তারপর উঠে এসে সুমুখে আমাকে দেখেই সে বিস্মিত হ'য়ে বল্‌লে, 'একি, এখনো যে দাঁড়িয়ে? চ'লে যান্‌ নি?'

মাথার সেই চওড়া সিঁদুর জল লেগে আরো যেন উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেচে। সকালের রোদ এসে পড়েছে মুখে। সুকোমল সে মুখশ্রী। বল্‌লাম, 'আপনারি অপেক্ষায়—'

'আমার অপেক্ষায়? ধৈর্য্য ত আপনার কম নয়!' ব'লে হেসে সে সূর্য্যপ্রণামটা সেরে নিল।

বল্‌লাম, 'তা হ'লে আমি এখন যাই, আপনি আস্‌বেন পরে।'

'দাঁড়ান, পাগলের উপর রাগ কর্‌বেন না। মেয়েমানুষকে আঘাটায় ফেলে রেখে স'রে পড়তে চান্‌? আমি কী করেচি আপনার?—ধরুন দেখি বিছানাটা, গরুর গাড়ী পর্য্যন্ত ব'য়ে নিয়ে চলুন।'

আমার হাতে বিছানাটা দিয়ে ভিজা কাপড়খানি হাতে নিয়ে স্তব-পাঠ করতে করতে সে আগে আগে চলতে লাগ্‌লো। ভিজা চুলের রাশ থেকে টস্ টস্ ক'রে জল প'ড়ে তার পিঠের কাপড়টা তখন সপ্‌ সপ্‌ করচে। এবারেও সে শাড়ী পরে নি, আর-একখানা নরুণপাড় ধুতি। তাকে অনুসরণ ক'রে চল্‌লাম। কিছুদূর এসে গরুর গাড়ী পাওয়া গেল। কয়েকজন যাত্রী ইতিমধ্যেই উঠে বসেচে, বারো জন হ'লেই গাড়ী ছাড়বে। বারো জন হলো কিন্তু গাড়ী ছাড়তে দেরি হচ্চে দেখে চারুবালা বকাবকি করতে লাগ্‌লো। এমন চঞ্চল, এমন অধীর মেয়ে ভূ-ভারতে দেখা যায় না। বাঁ-হাত দিয়ে কপালের চুল সরায় আর হেসে-হেসে সকলের সঙ্গে গল্প সুরু ক'রে দেয়। কয়েক-জন পশ্চিমা স্ত্রী-পুরুষ তার পরিষ্কার হিন্দী ভাষায় রসিকতা শুনে হেসে গড়িয়ে পড়্‌তে লাগ্‌লো। যেমন সহজ তেমন সাবলীল। একসময় উত্ত্যক্ত হ'য়ে সে ছইয়ের ভিতর থেকে নেমে পড়্‌লো। চোখ রাঙা ক'রে হিন্দী ভাষায় জানালো, 'চড়্‌বো না তোমার গাড়ীতে, আমার সময়ের দাম আছে। পয়সা দিলে কত গাড়ী মিলবে।'

ভিজা কাপড় আর বিছানা নিয়ে সে হন্ হন্ ক'রে চল্‌তে লাগ্‌লো। গাড়োয়ান ছুট্‌লো তার পিছনে-পিছনে। অনেক সেধে ভাল কথায় বুঝিয়ে তাকে আবার ফিরিয়ে আন্‌লো।

গাড়ী যখন ছাড়্‌লো তখন সে ভিজা কাপড়খানা ছইয়ের উপরে টাঙিয়ে রোদের দিক্‌টা আড়াল ক'রে দিল। বল্‌লে, 'কি দেখ্‌চেন বোকার মতো, ভাল হ'য়ে বসুন।'

একটি যুবক হঠাৎ এই সময়ে বল্‌ল—ভারি মুখরা মেয়ে ত?

—শুধু মুখরা? ভদ্রলোক কহিলেন, বাচাল, বেয়াদপ, মাঝে-মাঝে তার অমার্জ্জিত অভদ্র মন্তব্য শুনে গায়ের রক্ত আমার আগুন হ'য়ে উঠ্‌ছিল। নারীর সহজ মনের লাবণ্য আর সলজ্জতা তার বিন্দুমাত্রও নেই। এমন একটা উদ্ধত, বেয়াড়া মেয়ে আমি জীবনে

দেখি নি। কোনো মেয়ের জীবনে যদি শৃঙ্খলা না থাকে তবে তার চেহারা হয় কী ভয়ানক! হ্যাঁ, ঘণ্টা দুই বাদে অষ্টভুজার মন্দিরের ধারে এসে গাড়ী দাঁড়ালো, এইখান থেকেই পাহাড়ী হাঁটা পথ। মন্দিরের কাছে প্রকাণ্ড এক আশ্রম, সংসারত্যাগী কয়েকজন সন্ন্যাসী এখানে তপস্যা করেন। চারুবালা নেমে এসে বল্‌লে, 'আসুন, দেখিয়ে দিই আপনাকে, এই আমার গুরুবাড়ী। স্বামিজীকে দর্শন ক'রে যাবেন?'

বল্‌লাম, 'না, আপনি ঘুরে আসুন, আমি এখানে দাঁড়াই।'

'এই যে, —বলি, কি গো সনতের মা, এই যে বড়পিসী,—তোমরাও এসেচ দেখচি। যাচ্ছিলাম এই দিক দিয়ে, ভাব্‌লাম গুরুদেবকে একবার দেখেই যাই। চলো।'

একদল স্ত্রীলোকের সঙ্গে চারুবালা জুটে গেল। তারা পরস্পর হাসাহাসি ক'রে বল্‌তে লাগ্‌লো, 'ওমা, কি হবে গো, পাগ্‌লী আবার কোথা থেকে উড়ে এল মা? সিঁদুর দিয়ে মাথাটা যে জুবড়ে রেখেছিস্ মুখপুড়ি? এখনো মতি-গতি ফেরে নি? ক'বছর হলো?'

একে-একে সকল যাত্রী হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে চল্‌লো, ধূলোয় আর রোদে আমি রইলাম দাঁড়িয়ে। সে যে কী আকর্ষণ, কী মোহ তা' আর তোমাদের বোঝাতে পার্‌বো না, আমি তার জন্য সব হারিয়ে দেউলে হ'য়ে গেচি!—এ রোমান্স্ নয়, প্রেম নয়, একটা প্রবল ইল্যুশন, একটা দুঃস্বপ্ন!

ছেলেরা কহিল, আর তার দেখা পান্ নি?

—কিছুক্ষণ পরেই দেখা পেলাম। বৃদ্ধ বলিলেন, হতাশ হ'য়ে ভাব্‌চি, আর কেন? অনেক দূর পথ, এবার আস্তে আস্তে যাই! কিন্তু কয়েক পা এগিয়ে এসে যা' দেখ্‌লাম, আমি একেবারে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি! ধর্ম্মশালার দালানে ব'সে চারুবালা নিঃশব্দে চোখের জল ফেল্‌চে। বয়স আমার অল্প, প্রায় তারই সমবয়সী, নারীর অশ্রু

তখনো আমি সইতে পারিনে, সমস্ত মন আমার মমতায় দ্রবীভূত হ'য়ে এল। কাছে গিয়ে বল্‌লাম, 'কি হলো এর মধ্যে, কাঁদ্‌চেন কেন?'

'আপনি যান, আমি আর মুখ দেখাবো না কারু কাছে।' ব'লে সে দালানে উপুড় হ'য়ে শু'য়ে আবার ফুলে-ফুলে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। কিন্তু আমি গেলাম না, কোথায় যাবো তাকে ফেলে? আমার তখন সব হারিয়ে গেচে! চুপ ক'রে তার পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম। অশ্রুতে-অভিমানে রুদ্ধকণ্ঠে একসময়ে সে বল্‌লে, 'আমাকে কোনো অনুরোধ করবেন না, আমি এইখানে জীবন দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে যাবো। সবাই আমাকে অপমান করবে, আমি কি এতই হীন? যে-গুরুর কাছে মন্ত্র নিয়েছি তাঁর অন্নভোগ দেখ্‌বার অধিকার আমার নেই? তোমরা ব্রাহ্মণ, আমি না-হয় তাঁতীর মেয়ে! বেশ, আমি তাঁতি, আমি চণ্ডাল, আমি ডোম, আমি…' অঝোরে আবার সে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লো। '—আজ বুঝ্‌লাম যে, আমি ছোট জাতের মেয়ে, আমি হীন, কুৎসিত; তোমরাই বড়, তোমরাই মান্য!'

বহু ক্ষেদোক্তির পর সে চোখ মুছে উঠে বস্‌লো। দু' একটা কথা বল্‌তে গেলাম কিন্তু সে গ্রাহ্য করলো না। নিজের মনে উঠে জিনিসপত্র নিয়ে সে কোনোদিকে না তাকিয়ে পথে নাম্‌লো। মধ্যাহ্নের রোদে চারিদিক তখন টা টা করছে। মুখের উপর থেকে চুল সরিয়ে সে নিঃশব্দে পথ হাঁটতে লাগ্‌লো।

শীতের শেষ। সম্মুখের ছোট একটি পাহাড়ী নদী পার হ'তে হবে। নদীর ধারটি অতি শীর্ণ, সহজেই হেঁটে রাস্তা পার হ'য়ে গেলাম। নদীর পারেই পাহাড়ের পথ। চারুবালা আগে-আগে কিছুদূর এগিয়ে পাহাড়ের অনেকখানি অতিক্রম করে গেল। পিছনে সে চাইলো না, আমার সঙ্গে বন্ধুত্বের কোনো মূল্যই সে দিল না, অতএব তাকে অনুসরণ করার প্রবৃত্তি আমারো আর রইলো না, আমি চল্‌লাম ধীরে-ধীরে। পাহাড়ের এক একটা বাঁকে বহু দূরে তার দ্রুতগতিশীল

লীলায়িত মূর্ত্তিটি দেখ্‌তে পাচ্ছিলাম, সে অক্লান্ত চলেচে, কোথাও থাম্‌চে না, তাকে যেন পেয়ে বসেচে এক অবিরাম চলার নেশা! আমি তার কাছে হার মান্‌লাম।

ছেলেরা কহিল, এখানেই শেষ?

আর একবার নস্য লইয়া বৃদ্ধ কহিলেন, এখানে শেষ হ'লে মন্দ হ'তো না, কিন্তু তা' হয়নি। শেষটুকু সামান্যই, খুব সামান্য, জলের মতো সহজ। তার চরিত্রের যেটুকু অস্পষ্টতা সেটুকু আমার কাছে স্বচ্ছ হ'য়ে গেচে। বলি শোনো—

সাত আট মাইল পাহাড় ভেঙে সন্ধ্যার প্রাক্কালে এক নদীর তীরে এসে পৌঁছলাম। শরীর ক্লান্ত, শীত ধরেচে। কাছেই ছোট একটি ধর্ম্মশালা, কিন্তু যাত্রীর সংখ্যা এত বেশি যে জায়গা সঙ্কুলান হলো না। নদীর ধারে কয়েকটা সরকারি তাঁবু পড়েছে, সেখানেও স্থান নেই। এখানে-ওখানে আগুন জ্বালিয়ে যাত্রীরা রান্না করতে বসে গেচে। আগে-ভাগে এলে হয়ত আশ্রয় জুট্‌তো। নদীর চড়াতেই রাত কাটানো সাব্যস্ত ক'রে কয়েক পা এগোতেই পাশের তাঁবুর ভিতর থেকে চারুবালার গলার আওয়াজ পেলাম।

'এই যে, আসুন আসুন, জায়গা পান্ নি বুঝি?—তা' ত দেখ্‌তেই পাচ্চি। এত দেরী হলো আস্‌তে? আহা, হাঁটা অভ্যেস নেই কিনা, ভারি কষ্ট পেয়েচেন, কেমন?'

তার সাদর অভ্যর্থনায় ভীত ও স্তম্ভিত হ'য়ে গেলাম। যে-মনে সে কাছে ডেকে নেয়, সেই মনেই সে অকারণে মানুষকে বিতাড়িত করে। বল্‌লাম, 'জায়গা হবে?'

'হ'তেই হবে, আসুন, নৈলে এই রাতে যাবেন কোথায়? এই-টুকু তাঁবুতে কুড়ি জনের উপর লোক। এই খুঁটিটার কাছে একটু জায়গা হ'য়ে যাবে। খাওয়া-দাওয়ার কি ব্যবস্থা?'

'রান্না ক'রে নেবো।' ব'লে তাঁবুর মধ্যে ঢুক্‌লাম। ভিতরটা

যেন জন্তু বিশেষের খোঁয়াড়। কোনো ক্রমে এক জায়গায় ঝোলাটা নামিয়ে বল্‌লাম, 'আপনার আহারাদি ?'

'ওই যে, বাইরে মহারাজ-জী রান্না চড়িয়েচে।'

'মহারাজ আবার কে ?'

চারুবালা কলকণ্ঠে হেসে উঠে তাঁবুর ভিতরটা মুখরিত ক'রে তুল্‌লো। বল্‌লে, 'নতুন বন্ধু। এমন সবিনয়ে পথের মাঝখানে আলাপ কর্‌লো যে, মেয়েমানুষের মন, তখুনি খুসি হ'য়ে গেলাম। বেশ, ভাল, দুর্গম পথে সঙ্গে একটা পুরুষ মানুষ থাকা মন্দ কি ? ওগো ও মহারাজ ?'

তখন অন্ধকার হ'য়েছে। বাইরের খোলা জায়গায় যেখানে আগুন জ্বেলে রান্না হচ্ছিল সেখান থেকে গুরুগম্ভীর কণ্ঠে জবাব এল, 'কেঁও জি ?'

'চাওল্‌ বোল্‌তা হ্যায় ?'

'জি।'

আমার দিকে ফিরে হেসে চারুবালা বল্‌লে, 'কী নিঃস্বার্থ বন্ধু বলুন ত, এমন দেখেচেন কোথাও ? জল এনে দিল, রান্না ক'রে দিচ্চে, পথে শুনিয়েচে ভজন-গান, আমার সুখ-সুবিধের দিকে কড়া নজর, কিসে আমি খুসি হই···যান আপনি, আর দেরি কর্‌বেন না, চাল আর আলু এনে ভাতে-ভাত চড়িয়ে দিন, সারাদিন ত উপবাসেই কাট্‌লো আপনার।'

ধর্ম্মশালার দোকান থেকে জিনিসপত্র সংগ্রহ ক'রে আন্‌লাম। শীতের হাওয়ায় অন্ধকারে বাইরে থাকা এক ভয়ানক সমস্যা। কিন্তু উপায় নেই, পেটের ক্ষুধাটা সমস্ত দুর্য্যোগকে তাচ্ছিল্য করচে। কাঠ এনে কয়েকখানা পাথর একত্র ক'রে আগুন জ্বাল্‌বার চেষ্টা কর্‌লাম। উনুনটা ঠিক জুতসই কর্‌তে পাচ্ছিনে, কাঠ এত ঠাণ্ডা যে, জ্বল্‌তে চায় না। সে এক বিষম বিপদ। ইতিমধ্যে মহারাজের রান্নাবান্না হ'য়ে

গেল, ভাত-তরকারি নিয়ে সে ঢুক্‌লো তাঁবুতে। এতক্ষণে হারিকেনের আলোয় তার চেহারাটা দেখ্‌লাম। বয়স তার পঞ্চাশ থেকে সত্তরের মধ্যে, মাথায় একমাথা টাক্‌, গলায় একটা তুলসীর মালা, মুখে দাড়ি-গোঁফ, ছোট-ছোট ছুটো চোখ। সযত্নে সে চারুবালার কাছে হাতের জিনিসপত্র নামালো, চারুবালা তখন কম্বল ও বিছানার মধ্যে অতি আরামে ব'সে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে মধুরকণ্ঠে আলাপ কর্‌চে।

'মহারাজ, বাত্তি দে দেও বাবুকো।'

মহারাজ বল্‌লে, কৌন্‌ বাবু ?'

'হুঁয়া যো চাওল্‌ বনাতা, বেচারাকো তক্‌লিপ্‌ হোতা হ্যায় !'

মহারাজ অসন্তুষ্ট দৃষ্টিতে একবার আমার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে, 'তক্‌লিপ্‌ ত করনা চাই, তীরথ্‌ওয়ালে,—বাত্তি ক্যাইসে দেই ?'

'তোমার মুখে আগুন, ইতর কোথাকার।' ব'লে বিছানা ও কম্বল ছেড়ে চারুবালা বাইরে এল, আমার হাত থেকে জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিয়ে বল্‌লে, 'সরুন, অকম্মার ঢিপি আপনি, এমনি করে উনুন তৈরী করে ? কাঠের আগুন জ্বাল্‌তে জানেন না, কী জানেন তবে ?'

তিন চারখানা পাথর সাজিয়ে অতি সহজেই সে উনুন তৈরী করে আগুন জ্বাল্‌লো। বল্‌লে, 'যার কাজ তারেই সাজে, পুরুষ মানুষ কি আর রান্না করে খেয়েছে কোনোদিন ?'

ভাতের হাঁড়ি উনুনে সে চাপিয়ে দিল। বল্‌লাম, 'তরকারি কিছু করবেন ?"

মুখের উপর সে ধমক দিল,—'তরকারি ? ভারি লোভ যে আপনার ! বলে, বস্‌তে পেলে শুতে চায় ! ভাতে-ভাতই হ'য়ে ওঠে না, আবার তরকারি !' তারপর সে হেসে বল্‌লে, 'লোকটার কি হিংসে দেখ্‌লেন আপনার ওপর ?—আলোটা দিলে না !'

বল্‌লাম, 'হিংসে কেন ? কী কর্‌লাম ওর ?'

'ভারি ন্যাকা আপনি।' বলে সে ফুঁ দিয়ে কাঠ জ্বালিয়ে দিল। আলোয় দেখ্‌লাম, কাঠের ধোঁয়ায় ইতিমধ্যে তার চোখ দুটি রাঙা হ'য়ে উঠেচে, জল পড়্‌চে।

অনেক সাহায্যই চারুবালা কর্‌লো। খাওয়া-দাওয়ার পর নদীতে বাসন মেজে দোকানদারকে ফিরিয়ে দিয়ে যখন তাঁবুর ভিতরে এসে ঢুক্‌লাম তখন বেশ রাত হ'য়েচে। পথশ্রান্ত যাত্রীরা বিশেষ কেউ জেগে নেই। পাশাপাশি সবাই শুয়েছে। চারুবালার পাশে মহারাজ। টাক্‌পড়া মাথাটা সে সরিয়ে এনেচে চারুবালার বিছানার কাছে। লোকটা একটু স্নেহ-মমতা চায়।

'আহা, বুড়ো কত গল্পই কর্‌লো আমার কাছে। বৌ ম'রে যাবার পর থেকে সন্নিসী হয়েচে, অনেক দেশ ঘুরেচে, কিন্তু জীবনে আমার মতো মেয়ে আর দেখে নি—এই সব।'

তার কথা শুনে মহারাজ মাথাটা উঁচু ক'রে বল্‌লে, 'কেয়া বোল্‌তা?'

চারুবালা এক হাতে তার মাথাটা দাবিয়ে দিয়ে বল্‌লে, 'বল্‌চি যে, চুল পাক্‌লেই পুরুষ মানুষ বোকা হয়! বুঝ্‌তে পেরেচ গর্দ্দভ?'

মহারাজ অতি খুসি হ'য়ে আবার চোখ বুজ্‌লো। চারুবালা আবার বল্‌লে, 'বুড়ো হয়েচে তবু মেয়ে-ছেলের ওপর কী টান্‌ দেখ্‌চেন?—তোমার কি আর কিছু হবে বাবা? ইচ্ছে হচ্চে, তোমার গলা টিপে রাতারাতি শেষ করে রাখি!—আচ্ছা, মহারাজ?'

মহারাজ মুখ তুলে হেসে বল্‌লেন, 'কেয়া?'

চারুবালাও হেসে হেসে বল্‌লে, 'দেখুন দেখুন, আমার মাথা খান্‌, এবার এর জঘন্য চেহারাটা একবার দেখুন, যেন বুনো ওল্‌। মুখে কী লোলুপ কাঙালপণা দেখেচেন—এরাই আসে পুণ্যসঞ্চয়ে! মহারাজ, তোমাকে কি শাস্তি দেওয়া উচিত জানো?'

মহারাজ বোকার মতো অতি আনন্দে মাথাটা আবার উঁচু করে

তাকালো। চারুবালার চোখ দুটো তখন দপ্ দপ্ ক'রে জ্বল্‌চে। তবু সে হাসিমুখেই বল্‌লে, 'মনে ক'রো না, ঘেন্নায় উঠে তোমার কাছ থেকে স'রে যাবো, সে-মেয়ে আমি নই। কিন্তু আমার কি ইচ্ছে হচ্চে জানো ?—গরম সাঁড়াশি দিয়ে তোমার চোখ দু'টো উপ্‌ড়ে ফেল্‌তে!—যাক্, সাঁড়াশি ত আর নেই হাতের কাছে, তুমি বেঁচে গেলে! কিন্তু যদি দরকার হয়, তোমার বুকের ওপর ব'সে নখ দিয়ে তোমার গায়ের চামড়া ছিঁড়ে নেবো, বুঝ্‌লে বন্ধু!'

তাঁবুর ভিতরে সেই স্তিমিত আলোয় চারুবালার চেহারা দেখে আমার গা কেঁপে উঠ্‌লো। বল্‌লাম, 'ও একটু প্রশ্রয় পেয়ে অম্‌নি কর্‌চে, আপনি না-হয় একটু স'রেই যান না!'

'থামুন আপনি, ঠিক এমনি ক'রেই শোবো এখানে, ভয় কিসের ? সারারাত ও জেগে থাক্‌বে, আর আমি নাক ডাকাবো!'

বাইরে অন্ধকার, শীতার্ত্ত রাত্রি সাঁ সাঁ কর্‌চে। নদীর ওপারে বন, সেই বনে হাওয়া উঠে ঝড়ের মতো শব্দ আস্‌চে, তার সঙ্গে নদীর ঝর্ ঝর্ কলতান। যাত্রীদের কলরব নীরব হ'য়ে গেচে। অনেকক্ষণ নিঃশব্দে কাট্‌বার পর চারুবালা বল্‌লে, 'আপনার শোবার কষ্ট হচ্চে, বিছানাটা দেবো ?'

আবার সেই শাঁখের করাত। হ্যাঁ, না, কিছুই বল্‌তে পার্‌লাম না, চুপ ক'রে রইলাম।

'ঘুমোলেন নাকি ? এমন ঘুম ত কোথাও দেখি নি বাপু ?'

বল্‌লাম, 'বিছানা চাই নে, এইতেই হ'য়ে যাবে'।'

সে বল্‌লে, 'আমার বিছানাটি দেখেচেন ত ? একটি ছোট্ট বালিশ আর অড়-পরানো একখানি কাঁথা।'

'কম্বল একখানা আন্‌লে পার্‌তেন!'

'না, এ দুটি ছাড়া আর কিছুই আমি ব্যবহার করি নে। কি শীত কি গরম,—এই কাঁথা আর বালিশটি। আজ ন'বছর এই দুটি আমার

সঙ্গে সঙ্গে আছে।' দুই হাতে ভর দিয়ে উপুড় হ'য়ে মাথাটা সে তুল্‌লো। স্তিমিত দীপালোকে তার মাথার চওড়া সিঁদুরের দাগটা জ্বল্‌ জ্বল্‌ কর্‌চে।

মুখের উপর থেকে চুল সরিয়ে সে বল্‌লে, 'আপনাকে বিছানাটা দিতে চাইলাম বটে কিন্তু দিতাম না, এ বিছানায় আমি কাউকেই শুতে দিই নে। কেউ এর যোগ্য নয়।'

এইবার সুবিধা পেয়ে বল্‌লাম, 'আপনার স্বামী কোথায়?'

'এই বিছানা তাঁরই,—কিন্তু তিনি নেই!'

'নেই, মানে?'

'সে অনেক কথা। আমার বয়স তখন আঠারো,—বাপের বাড়ী থেকে আস্‌ছিলাম শ্বশুরবাড়ী। শ্বশুরবাড়ীর দরজায় পা দিতেই শুন্‌লাম, স্বামী মারা গেছেন ক'দিন আগে।—এ কি হয় কখনো? সুস্থ মানুষ রেখে গেলাম, জলজ্যান্ত মানুষ সে যাবে ম'রে? মরা কি এতই সহজ? সত্যি বল্‌তে কি, আমি সেদিন পাগল হ'য়ে গেলাম। সে মরে নি, তার মর্‌বার কথা নয়,—চব্বিশ বছরের ডাকা-বুকো ছেলে। যদি সে মর্‌বেই, আমার কোলে তার মরণ হলো না কেন? তখনই ছুট্‌লাম সেই মৃত্যুর পিছনে। মন্ত্র প'ড়ে বিবাহ হ'য়েছিল, সে-মন্ত্র কি মিথ্যে? তাকে আমি ফিরে পাবোই একদিন, একদিন না একদিন তাকে ধ'রে ফেল্‌বোই!'

সেদিন কী রহস্যময় অন্ধকার রাত! তোমরা কখনো দেখেচ, নারীর আত্ম-প্রত্যয়ের চেহারা কেমন? ভিতরের জ্যোতিঃ বাইরে আসে কেমন জ্যোতির্ম্মণ্ডল হ'য়ে? তোমরা কোনোদিন সতী-নারীর দেখা পেয়েচ?

'ফিরে পাবোই একদিন—'এই কথা বল্‌তে-বল্‌তে চারুবালা রোমাঞ্চ হলো। চোখে তার এলো স্বপ্নঘোর, কণ্ঠে এল সঙ্গীত, তার রূপ হলো অপরূপ। সেদিন আর তাকে বিচার করি নি, বিশ্লেষণ

করি নি, সেদিন তাকে অনুভব করেছিলাম। সে আবার বল্‌লে, 'ন'বছর কাট্‌লো তাঁকে খুঁজে-খুঁজে। এই বিছানা তাঁর, এই দেহ তাঁর, আমি তাঁর, আমার যা' কিছু সমস্তই তাঁর হাতে সঁপে দেবো ব'লে ছুটে চলেচি, আমাকে ছেড়ে তিনি কোথায় যাবেন বলুন ত? কত দুঃখে আমার দিন কাটে, কত বিপদে···তিনি নির্দ্দয়, আজও তাঁর দেখা নেই!' বল্‌তে বল্‌তে চারুবালার চোখে জল এল।

'সমস্ত জীবন ধ'রে লোকের ভীড়ে তাঁকে খুঁজে বেড়াবো। পাবো না তাঁকে, ধর্‌তে পার্‌বো না, বলুন ত আপনি?'

পাগল, পাগল, উন্মাদ মেয়ে! তাঁতীর রক্ত তার দেহে, তাই হয়ত আজও বুন্‌চে তার ইন্দ্রজাল!

প্যাসেঞ্জার ট্রেণের গতি মন্থর হইয়া আসিল। রাত আর বাকি নাই। বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, পঁচিশ বছর আগের ঘটনা, গুছিয়ে বলা গেল না ভাই। আচ্ছা,—এই ষ্টেশনে আমাকে নাম্‌তে হবে।

ছেলেরা ব্যস্ত হইয়া কহিল, তারপর, তারপর?

গাড়ী তখন থামিয়াছে। স্যুট্‌কেশটা হাতে লইয়া তিনি কহিলেন, তারপর সকাল হলো। ঘুম ছাড়িয়ে আমি আর মহারাজ উঠে ব'সে অবাক হ'য়ে দেখ্‌লাম, তাঁবুর মধ্যে কেউ কোথাও নেই। যাত্রীর দলের সঙ্গে চারুবালা ভোর রাত্রেই পালিয়েচে আমাদের ছেড়ে। বলিয়া ভদ্রলোক নামিয়া পড়িলেন।

অন্ধকারে গলা বাড়াইয়া একটি যুবক ব্যাকুল হইয়া কহিল, আর দেখা পান্ নি? ও-মশাই?

দূর হইতে উত্তর আসিল, 'না।'

চারি জনেই নীরবে বসিয়া রহিল। আবার গাড়ী ছাড়িয়াছে। কোথায় যেন তাহারা ভাঙিয়া চুরমার হইয়া গিয়াছে। আর তাহাদের কথা বলিবার কিছু নাই।

একজন কেবল কহিল, লোকটার চুল পেকেচে, কিন্তু কী মিথ্যেবাদী বল ত'? সাবিত্রী-সত্যবানের গল্পটা কেমন গোঁজামিল দিয়ে চালিয়ে গেল!—জোচ্চোর কোথাকার!

কিন্তু বাকি তিনজন তেমনিই নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। গাড়ী সাঁ-সাঁ করিয়া ছুটিতেছে।

॥ ছয় ॥
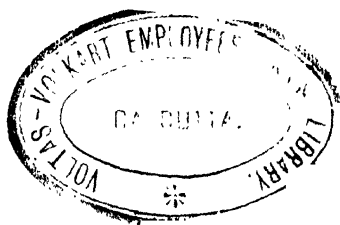
সর্ব্বময়ী কর্ত্রী বলিতে যাহা বুঝায় ছোড়দি এ বাড়ীর তাই। ছোড়দির শাসনে সকলে তটস্থ হইয়া থাকে। বৈদ্যুতিক শক্তি যেমন সকল যন্ত্রগুলিকে সচল করিয়া রাখে তেমনি ছোড়দির একটি গোপনসঞ্চারিণী প্রেরণায় পরিবারের সকলে জীবন নির্ব্বাহ করে বলিলেও অত্যুক্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। ছোড়দির ছোড়দি বলিয়াই খ্যাতি, তিনি স্বপদবীধন্যা। আসল নামটি তাঁহার সকলে ভুলিতে বসিয়াছে। বহুদিন ধরিয়া ভিতরে বাহিরে ছোড়দি বলিয়াই তাঁহার বিজ্ঞাপন চলিয়া আসিতেছে।

পিসিমা, মাসিমা, খুড়িমা, জেঠিমা, বড় ভাইয়ের স্ত্রী, বাড়ীর অসংখ্য ছেলেমেয়েরা, কর্ত্তা মহাশয়, সরকার নিকুঞ্জবাবুর পরিবার—সকলের ঘরেই ছোড়দি। চক্‌চকে আসবাবপত্র, রগরগে ঘর-দালান, পরিচ্ছন্ন বেল ও তুলসীতলা, ঠাকুর ঘর, সুসজ্জিত স্নানের কক্ষ—ইহাদের দিকে তাকাইলেই ছোড়দি সকলের চোখে সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবেন। ইহারা সবাই পাশাপাশি থাকিয়া হাসিয়া হাসিয়া নীরবে তাঁহার প্রশংসা করিতে থাকে। ছেলেমেয়েগুলি সচ্চরিত্র, কারণ তাহাদের চরিত্রের মধ্যে আছেন ছোড়দি; বাড়ীর অন্যান্য মহিলারা, পিতা, সরকার, ঠাকুর, ঝি-চাকর, ভাই-বোনেরা—ইঁহাদের প্রতিদিনের জীবনে একটিবারও ছন্দপতন হয় না, তাহার কারণ ছোড়দি একজন বিশিষ্ট ছন্দশিল্পী; ইঁহাদের লইয়া তিনি ছন্দে বাঁধিয়াছেন, এই সংসারটি তাই সকলের চোখে হইয়াছে একটি ভাবব্যঞ্জনাময়ী কবিতা।

ছোড়দি—

ছোড়দি ছাড়া আর কথা নাই। রান্নায়, খাওয়ায়, পূজায়, হাসিতে,

গল্পে, গানে, রোগে, দুঃখে, অভাবে একটিমাত্র নাম—ছোড়দি। পাড়ায় বিষ্ণুবাবুর বাড়ীতে তামাকের আড্ডা, সেখানে ছোড়দি; ছেলেদের ড্রামাটিক ক্লাব, সেখানে ছোড়দি; পার্ব্বতী গয়লানির পরনিন্দা-পরচর্চ্চার আসরে, সেখানেও ছোড়দি।

সংসার চলে ছোড়দির মুখ তাকাইয়া। বাজার খরচ, গোয়ালার ফর্দ্দ, ধোবা ও মুদীর হিসাব, ঝি-চাকরের মাহিনা ও বক্‌শিস্—এ সব ছোড়দির তাঁবে। ছোট ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার পরীক্ষা, স্কুল-ফি, খেলার চাঁদা, চড়িভাতির খরচ—এরা ছোড়দির হাতে। বড় ছেলেমেয়েদের গাড়ীভাড়া, বায়স্কোপ দেখা, হাওয়া বদলাইতে যাওয়া, দর্জ্জির হিসাব, পকেট-খরচ—এ সমস্তই ছোড়দির করতলগত।

এমন নারীকে দেখিতে কাহার না কৌতূহল হয়?

পূজার ঘর হইতে হাসিমুখে ছোড়দি বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা আসিয়া একে একে তাঁহার পায়ের ধূলা লইল। তিনি হাত বাড়াইয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন না, কেবল প্রসন্ন উদাসীন দৃষ্টিতে তাহাদের দিকে একবার তাকাইয়া ঠাকুর ঘরের দরজায় শিকল তুলিয়া দিলেন।

আপনি ছাড়া তুমি বলিয়া তাঁহাকে ডাকিতে সাহস হয় না। পরণে একখানি তসরের ধুতি, গলায় সোণার চেন-এ বাঁধা একছড়া রুদ্রাক্ষের মালা, বাঁ-হাতের কনুইয়ে একগাছি সোণার বাহুবলয় ছাড়া দুইখানি হাত সম্পূর্ণ নিরাভরণ; সদ্যস্নাত মাথায় অপরিমাণ রুক্ষ চুলের রাশির মধ্যে প্রাতঃসূর্য্যের আলো প্রবেশ করিয়া রামধনুর মত বিচিত্র বর্ণ খেলা করিয়া বেড়াইতেছে। সুন্দর মুখখানি স্নিগ্ধ, কিন্তু আপন গাম্ভীর্য্যে সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া তিনি নিজের ঘরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি দরজাটা ভেজাইয়া দিলেন।

আসবাবপত্রের বিলাস ঘরের মধ্যে প্রচুর; সৌখিন এবং আধুনিক

গৃহসজ্জা। পাশেই বড় একটা স্ফটিকপাত্রে জলের মধ্যে কতকগুলি নানা রঙের মাছ খেলা করিতেছে। ছোড়দি প্রথমে সুইচ বোর্ডে রেগুলেটর ঘুরাইয়া মন্দগতি পাখা খুলিয়া দিলেন, তারপর একটি ব্লাউজ ও একখানি ধবধবে সাদা ধুতি লইয়া কাপড় ছাড়িতে লাগিলেন।

যখন পুনরায় বাহির হইয়া আসিলেন তখন কিছু পরিবর্ত্তন হইয়াছে। তখন আর রূপের বর্ণনা করিতে সঙ্কোচ হয় না। প্রথমেই নজরটা গিয়ে পড়ে তাঁহার দেহের বয়সটার দিকে। মনে হয় কুড়ি হইতে পঁচিশের মধ্যে কোন্ একটা অঙ্কে গিয়া হঠাৎ তাঁহার কোমল ও দীঘল দেহখানি থমকিয়া দাঁড়াইয়াছে। পূজাসন হইতে উঠিয়া তপস্বিনী অপর্ণার মত তাঁহার দীর্ঘায়ত চোখে সন্ধ্যা তারার যে গভীরতা ছিল, এখন সে চোখে নামিয়াছে বুদ্ধি এবং জীবন-চেতনার দীপ্তশ্রী, সে দৃষ্টি শুধু অন্তর্ভেদী নয়, উজ্জ্বলও বটে।

প্রথমেই তিনি একটি নয় দশ বছরের মেয়ের দিকে তাকাইয়া কহিলেন, খুকি, তোমার গানের সুর মুখস্থ হয়েছে?

খুকি কহিল, হয়েছে ছোড়দি, শুনবেন?

শুনবো চল।

পাশের ঘরে গিয়া খুকি টেবিল হারমোনিয়ম খুলিয়া গান গাহিতে বসিল, ছোড়দি পাশে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিলেন। শুনিয়া তিনি খুসি হইলেন। বলিলেন, বেশ হয়েছে, তবে সামান্য 'ইমন-কল্যাণ' সেট্ করতে এত দেরী হওয়া উচিত হয়নি।

আপন অক্ষমতায় খুকি মাথা হেঁট করিয়া রহিল।

পিছন হইতে মণ্টু কহিল, ছোড়দি, পঞ্চু বল্‌লে—ও আর এমন কাজ কখনো করবে না। আজ থেকে—

ছোড়দি ঘাড় ফিরাইয়া দৃঢ় দৃষ্টিতে তাকাইলেন। কহিলেন, সে হবে না, পরের জিনিসে যে না বলে হাত দেয় তার শাস্তি কমতে

পারে না। এখনো দু'দিন তোমরা কেউ ওর সঙ্গে কথা বলবে না। মণ্টু, তোমার গালিভার্স ট্রাভল্ শেষ হয়েছে?

মণ্টু কহিল, হয়েছে।

এবার জুলে ভার্ণের বই পড়তে দোবো। একটু শক্ত তা হোক। বলিয়া ছোড়দি বাহির হইয়া আসিলেন।

বাহিরে বামুন ঠাকুর অপেক্ষা করিতেছিল, তাঁহাকে সুমুখে পাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, আজ কি কি রান্না হবে?

ঝি বাজারে গেছে, সে এলে খবর নিও ঠাকুর।—বলিয়া ছোড়দি অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন; চলিয়া তিনি কেন গেলেন তাহা সবাই জানে। প্রতিদিন সকালে এই সময়টায় বাবা, দাদা, পিসিমা, বৌদিদি প্রভৃতির শারীরিক সংবাদ লওয়া তাঁহার প্রধান কাজ। নিজে তিনি সকলের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করেন। দুপুরবেলা কোন্ এক সময় ঘণ্টাখানেকের জন্য তাঁহার দাতব্য ঔষধালয় খোলা থাকে। পাড়ার মেয়েরা তাঁহার নিকট হইতে ঔষধ ও ব্যবস্থা লইয়া ধন্যবাদ দিয়া যায়।

এমনি করিয়াই ছোড়দির দিন কাটে। তাঁহার নিকটে কেহ নাই, সবাই আছে আশে পাশে। তিনি নিয়মের বন্ধন স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু নিজের বন্ধন কোথাও সৃষ্টি করেন নাই। সকলের সংবাদ লইয়া বেড়ানো যাঁহার কাজ, নিজের সংবাদ লইবার তাঁহার সময়াভাব। তাঁহার চারিদিকে আছে শৃঙ্খলা, কিন্তু শৃঙ্খল কোথাও তাঁহার নাই। তবু তাঁহার আসল চেহারাটা মাঝে মাঝে প্রকাশ হইয়া পড়ে। বাড়ীর মধ্যে কোথাও হাসি তামাসা আরম্ভ হইলে তিনি সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া যান। সামান্য মিথ্যাকথা কেহ বলিলে যন্ত্রণায় রাত্রে তাঁহার ঘুম আসে না। সংবাদপত্রের মারফৎ যদি নারী-হরণের কথা তাঁহার কানে আসে, এই ভয়ে তিনি খবরের কাগজ বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে আধুনিক কোনো উপন্যাস

কি নাটক প্রবেশ করিবার হুকুম নাই। মন্টু একদিন কোথা হইতে কি একটা অশ্লীল কথা শিখিয়া আসিয়া এ বাড়ীতে তাহার পুনরুক্তি করিয়াছিল বলিয়া তিন দিন তিনি লুকাইয়া কাঁদিয়াছিলেন। কেহ কোথায় অন্যায় করিয়াছে শুনিলে ভয়ে ও বেদনায় তাঁহার সর্ব্বশরীর থর থর করিয়া কাঁপিতে থাকে! ছোড়দি এমনিই!

ভাঁড়ার ঘর হইতে তিনি বাহির হইয়া আসিতেছিলেন, ছোট ভাই বিজু আসিয়া তাঁহার কাছে দাঁড়াইল। একটি হাত ধরিয়া কহিল, ছোড়দি, কাল আমাদের ম্যাচ্ খেলা হয়নি, জানো ত?

ছোড়দির চোখ দুইটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিলেন, হয়নি? কেন রে?

আমাদের বন্ধু শ্রীমান্ বাদলবাবু এসে জুটতে পারলেন না!

তাহার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া ছোড়দি হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, ট্রেণ ফেল্ করেছিল নাকি? বর্দ্ধমান থেকে তার আসবার কথা না?

বিজু কহিল, হ্যাঁ, বর্দ্ধমান থেকে। চমৎকার খেলে, না ছোড়দি? ও ছেলেটা সব দিকেই স্মার্ট। মনে হচ্ছে এবার আই-এতে অনেক টাকা দামের স্কলারশিপ্ পাবে। আমাকে একটা চিঠি লিখেছে, এইমাত্র পেলাম।

ছোড়দি কহিলেন, তা-হলে আসতে পারলে না?

সেই কথাইত বলছি তোমাকে, বেলা তিনটে নাগাৎ সে এসে পৌঁছবে ছোড়দি। আমাদের এখানেই থাকবে, কেমন?

বেশ ত, ওদিকের বারান্দার ঘরটা তাকে দিও। বেশ ঘরটি। বিজু খুসি হইয়া হঠাৎ আনন্দে ছোড়দির কোলের মধ্যে মাথা গুঁজিয়া একবার আদর করিয়া লইল, তারপর হাত ছাড়াইয়া ছুটিয়া চলিয়া যাইতেছিল, ছোড়দি হাসিয়া কহিলেন, মনের মতন সঙ্গী আসবে শুনলে এমনিই হয়,না রে বিজু? বাদল বুঝি তোদের হাফ্ব্যাকে খেলে?

হ্যাঁ ছোড়দি, সেন্টার হাফ্। শীগ্গিরই একদিন দেখ্বে তুমি, বাদল মোহনবাগানের ডিফেন্সে নেমেছে! বলিতে বলিতে বন্ধুর গৌরবে গর্ব্বিত মুখখানি লইয়া বিজু বাহিরে চলিয়া গেল।

ছোড়দি কিয়ৎক্ষণ এক দৃষ্টিতে তাহার পথে তাকাইয়া রহিলেন, তারপর রান্নাঘরে দরজায় গিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, ঠাকুর ওবেলা পটলের চপ্ আর মাংস রান্না কোরো। রান্না যেন ভাল হয়। বলিয়া উত্তর না শুনিয়াই তিনি সেখান হইতে সোজা উপরে উঠিয়া গেলেন।

বেলা তিনটার পর ছোড়দি বারান্দা হইতে নীচে তাকাইয়া দেখিলেন, একটি বলিষ্ঠ সুশ্রী ছেলে বিজুর গলা ধরাধরি করিয়া হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। ছোড়দি সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন। দুই বন্ধু পায়ের শব্দ করিয়া উপরে উঠিয়া আসিল। পরিচয় আগেই ছিল সুতরাং তাহার প্রয়োজন হইল না। বাদল হেঁট হইয়া পায়ের ধূলা লইয়া কহিল, চিনতে পারেন ছোড়দি?

ছোড়দি হাসিয়া কহিলেন, না। অনেক বড় হয়ে গেছ।

বেশ লোক ত আপনি? দু'বছরেই এত বড় হ'য়ে গেলাম যে চিনতেই পারছেন না?

ছোড়দি কহিলেন, আগে একটু রোগা ছিলে। রোগা আর দুরন্ত।

এখনই বুঝি খুব শান্ত হয়েছি? বলিয়া বাদল হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, তা হলেই খুব আমাকে চিনেছেন দেখছি। আগে ইস্কুল পালাতাম, আজকাল কলেজ পালাই।

উত্তরে ছোড়দি কহিলেন, স্কলারশিপ্ যে পায় তার কলেজ পালানো আমি সইতে পারি।

বাদল কহিল, এই ষ্টুপিড্ বুঝি আমার স্কলারশিপের খবর আপনাকে দিয়েছে?

বজু কহিল, তুমি পেতে পারো আমি বল্তে পারিনে?

বাদল কহিল, বাঁধাবাঁধি আমার ভাল লাগে না! যাক্ সে কথা, আপনি কেমন আছেন বলুন।

বলত কেমন আছি?

ছোড়দি যে বিধবা, সংসারের সাধ আহ্লাদ যে তাঁহার চলিয়া গেছে এই সামান্য কথাটা সহজেই সকলে বুঝতে পারে। বাদল মাথা হেঁট করিয়া বলিল, আমি কি করে বলব?

ছোড়দি তাহার অপ্রতিভ অবস্থাটি উপভোগ করিয়া হাসিতে লাগিলেন। বলিলেন, মানুষ কেমন থাকে তার মুখ দেখ্‌লে বোঝা যায় না?

বাদল হাসিয়া কহিল, খানিকটা বোঝা যায়, খানিকটা দুর্ব্বোধ্য।

সেইজন্যেই ত এত অশান্তি। এস ভাই এই তোমার ঘর। বিজু, বাদলের স্যুটকেসটা রেখে এসো ও-ঘরে। বলিয়া ছোড়দি আগে আগে গিয়া ছোট ঘরটিতে প্রবেশ করিলেন।

বাদল কহিল, ছোড়দি, আমি কিন্তু নিতান্ত অস্থায়ী লোক। কাল সকালে আমাকে বর্দ্ধমানে গিয়ে পৌঁছতেই হবে।

ছোড়দি হাসিয়া কহিলেন, হাওয়ার মতন এলে, তা বলে ঝড়ের মতন চলে যাওয়া হবে না।

বাদল কহিল, তা বলছিনে ছোড়দি, কাল আমাদের কলেজে টাকা জমা দেবার শেষ তারিখ, তাই যেতেই হবে। আজ রাতে একবার যাবো বৌবাজারের মেজদিদির কাছে। আমার বড়দা গিছলেন হিমালয় ভ্রমণে, সেখান থেকে এনেছেন শিলাজিত্, এক শিশি মেজদিদিকে দিয়ে আসব।

একটা চেয়ারে গিয়া বাদল বসিল, ছোড়দি সুইচ টিপিয়া তাহার মাথার উপরে পাখা খুলিয়া দিলেন। তাহার কপালের পাশ দিয়া যে দুইটি ঘামের ধারা নামিয়া আসিয়াছিল ছোড়দি তাহার দিকে

তাকাইয়া কহিলেন, বেশ ত, যাবার ব্যবস্থা আমার হাতে, তুমি এখন মুখটা মুছে ফেল দেখি। পাঞ্জাবীটা খোল ; স্নান করবে ?

আগে চা খাবো।

আগে না, আগে স্নান করো। তোমার ম্যাচ ক'টার সময় ? সাড়ে পাঁচটা ত ? অনেক সময় আছে । খোল, পাঞ্জাবীটা আগে খুলে ফেল।

আপনি যান ছোড়দি, খুলছি।

এখনই খোল, লজ্জা করবার মতন দেহ তোমার নয়। খুলে স্নান করে এসো। এই কাপড় রয়েছে টাঙানো !

গায়ের জামা খুলিতেই ছোড়দি সেটি তাহার হাত হইতে লইয়া আলনায় তুলিয়া রাখিলেন। বলিলেন, শরীরটাকে এমন মজবুত করে গড়েছ, পুলিশে না বিপ্লবী সন্দেহ করে ধরে নিয়ে যায়।

বিজু নীচু হইতে কহিল, ছোড়দি খাবার তৈরী হয়ে গেছে।

ছোড়দি গলা বাড়াইয়া কহিলেন, আচ্ছা। এসো ভাই, তোমার বাথরুমটা দেখিয়ে দিয়ে যাই। বলিয়া বাদলের হাত ধরিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন।

ছোড়দির এই সহৃদয় ও ঐকান্তিক আতিথ্যে বাদল একটু থতমত খাইতেছিল। ছোড়দি তাড়াতাড়ি নিজের ঘরে গিয়া সাবান গামছা তোয়ালে প্রভৃতি লইয়া আসিলেন। বলিলেন, এসো, এইটা বাথরুম, এই সাবান রইল ভাই। 'গডরেজ' কি 'চন্দন' যা ইচ্ছে মেখো। যাই, তোমার চা তৈরী করিগে।

স্নান করিয়া যখন বাদল বাহির হইয়া আসিল, ছোড়দি চিরুণী ও বুরুশ দিয়া তাহার মাথা আঁচড়াইয়া দিলেন। নিজ হাতে তিনি চা ও খাবার লইয়া আসিলেন। বিজু আসিয়া একবার তাড়া দিয়া গেল। ছোড়দি তাহাকে খাওয়াইতে বসিয়া কহিলেন, আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ যে তুমি পর !

বাদল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, সেবারও আপনি এই নালিশ করেছিলেন। আমি পর, সে ত আপনার চোখের দোষ ছোড়দি!

চোখের দোষ হতে পারে, তবুও তুমি আপন নও। দাঁড়াও ভাই, ছেলেদের খাওয়াটা একবার দেখে আসিগে। বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

ফিরিয়া যখন আসিলেন, দেখিলেন বাদল হাফ্‌প্যাণ্টে দড়ি লাগাইয়া কোমরে বাঁধিতেছে। ছোড়দি হাসিয়া বলিলেন, ও কি হচ্চে, চোরের মতন? দাঁড়াও আমি বেল্ট্ এনে দিচ্ছি। আমার কাছে যা নেই তা বাজারেও নেই!

কিন্তু যা আছে তা যে কোথাও নেই ছোড়দি?

কী সে? বলিয়া তিনি উত্তর না শুনিয়াই আবার বাহিরে চলিয়া গেলেন।

কোমরে বেল্ট্ বাঁধিয়া ছোড়দির নিকট হইতে দইয়ের টিপ্ লইয়া তারপরে তুই বন্ধু ম্যাচ খেলিতে বাহির হইয়া গেল। বারান্দায় দাঁড়াইয়া ছোড়দি তাহাদের পথের দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

বাদল যখন ফিরিল তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে। আহারাদি করিয়া রাত্রে তাহার চলিয়া যাইবার কথা। বৌবাজারে রাতটুকু কাটাইয়া সকালের গাড়ীতে সে বর্দ্ধমান ফিরিয়া যাইবে। বারান্দায় আসিতেই সে দেখিল তাহার ঘরের অন্য দরজা দিয়া ছোড়দি বাহির হইয়া গেলেন। বাদল ডাকিল না, চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই আর কাহারও জানিতে বাকি রহিল না, আজকার ম্যাচ খেলায় তাহারা হারিয়া আসিয়াছে। সংবাদ শুনিয়া ছোড়দি বাহির হইয়া আসিলেন। বাদল কহিল, কি করব বলুন ছোড়দি, দশচক্রে ভগবান আজ ভূত হ'লো। একা কি করতে পারি বলুন ত?

ছোড়দি হাসিলেন। কহিলেন, আমার টিপ্ নিয়ে যারা যায়, তারা কোথাও জয় ক'রে ফেরে না। তারা আসে লজ্জা নিয়ে, তাইতেই আমার আনন্দ।

অবাক হইয়া তাঁহার দিকে তাকাইয়া বাদল কহিল, কি বলচেন ছোড়দি?

ছোড়দি কহিলেন, এমন নয় যে মানুষের অপমান দেখে আমার আনন্দ। আমার আনন্দ ভাই তাকে দেখে, যার ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়, যে দুঃখ পেয়েছে, যে হেরেই এসেছে বার বার। তাঁহার চোখ দুইটি চক্‌চক্ করিয়া উঠিল।

বাদল একটু অধীর হইয়া কহিল, আপনার চরিত্র অত্যন্ত এ্যাবসার্ড!

তা হবে। ছোড়দি কহিলেন, তাই ত বলচি ম্যাচে যে জেতে তার সঙ্গে আমার ম্যাচ করে না।—মৃদু মৃদু হাসিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

যাইবার একটা তাড়া ছিল। ছোড়দি অনুরোধ করিতে নিবৃত্ত হইয়া বাদলকে খাওয়াইতে বসাইলেন। বিজু পাশে বসিল। সে আজ ছোড়দির দিকে তাকাইয়া ক্ষণে ক্ষণে বিস্মিত হইতেছিল। ছোড়দির গাম্ভীর্য্য যেন আজ কোন্ অলক্ষ্য মুহূর্ত্তে খসিয়া গিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গ ছাপাইয়া আজ যেন তাঁহার বিপুল উৎসাহের জোয়ার।

আহারাদির পর ছোড়দি উঠিয়া ভিতর বাড়ীতে আর সকলের খাওয়া দাওয়ার তদ্বির করিতে গেলেন। ছেলেমেয়েরা তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় রহিয়াছে।

বাদল জামা কাপড় পরিয়া লইল। বিজু তাহাকে বাস্‌এ তুলিয়া দিয়া আসিবে বলিয়া প্রস্তুত হইল, কিন্তু ইতিমধ্যে হঠাৎ একটি ঘটনায় সে একটু চঞ্চল হইয়া বাদলের মুখ চাওয়াচায়ি করিতে লাগিল। তাহার ছোট স্যুটকেসটি আর খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না।

এইত এই টিপয়ের ওপর রেখেছিলাম, তুই বুঝি কোথাও সরিয়ে রেখেছিস !

না রে। আমি হাতই দিই নি—বাদল বলিল।

তবে গেল কোথায় ? বলিয়া বিজু ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে খোঁজাখুজি করিতে লাগিল।

এ ঘরে আঁতিপাঁতি খুঁজিয়া সে গেল পাশের ঘরে। সে ঘরে সমস্ত ওলটপালট করিয়া খুঁজিল। ছেলেদের ঘরে গিয়া খুঁজিয়া বেড়াইল, নিজের ঘরে গিয়া চারিদিক দেখিল। শেষকালে ভিতরে ঢুকিয়া ছোড়দিকে কহিল, বাদল এবার যাবে ছোড়দি, তার স্যুটকেসটা কোথায় ?

ওই ত ওখানে ছিল, তুমিইত রেখেছ। ছোড়দি কহিলেন।

বিজু আবার ফিরিয়া আসিল। ভয়ে তাহার ক্ষণে ক্ষণে ঘাম দেখা দিতেছিল, সারা গায়ে এক একবার কাঁটা দিয়া তাহার শীত করিতে লাগিল। এ বাড়ী হইতে চুরি হইবার সম্ভাবনা ত নাই ! না বলিয়া এ বাড়ীতে কেহ কাহারও জিনিসে হাত দেয় না ! সে চুপি চুপি গিয়া একে একে সকল ছেলে মেয়ে এবং ভাইবোনদের জিজ্ঞাসা করিয়া আসিল। ভিতর বাড়ীতে গিয়া খোঁজ করিয়া আসিল; বাবা, খুড়িমা, দাদা, বৌদিদি সকলকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল কেহই বলিতে পারিলেন না। এইবার ছোড়দির কানে উঠিতে বাকি থাকিবে না। অতিথির জিনিস তাহাদের এই সম্ভ্রান্ত বাড়ী হইতে চুরি গিয়াছে শুনিলে অপমানে ছোড়দির চির-উন্নত মস্তক ধূলায় লুটাইবে, এত বড় লজ্জা তিনি সহিতে পারিবেন না ! সকলে ছি ছি করিবে, সকলেই বলিতে থাকিবে ছোড়দির সৎশিক্ষা এ বাড়ীতে ব্যর্থ হইয়াছে। ছেলেদের অবস্থাটাই বা কি হইবে ? ভাবিতে ভাবিতে তাহার গা রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। পেটের ভিতর হঠাৎ একটা যন্ত্রণা অনুভব করিয়া সে চঞ্চল হইয়া ভূতের মত চারিদিকে ঘুরিয়া

বেড়াইতে লাগিল। ভয়ে, লজ্জায়, গ্লানিতে, দুঃখে, অপমানে তাহার দম আট্‌কাইয়া আসিতেছিল। এ বাড়ীর প্রত্যেকটি ছেলে এবং প্রত্যেকটি মেয়ের কপালে চৌর্য্য বৃত্তির কলঙ্ক লেপিতে আর দেরী নাই! তাহার বন্ধু যাইবার সময় জানিয়া যাইবে, ঐশ্বর্য্যবান হইলেই সচ্চরিত্র হয় না, ধনাঢ্য হইলেও সামান্যর লোভ ইহারা এড়াতেই পারে না; মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি সমস্ত স্বচ্ছল অবস্থার আবরণ ভেদ করিয়াও এক একবার কুৎসিতভাবে প্রকাশ হইয়া পড়ে। সে জানিয়া যাইবে ইহারা সবাই চোর, ইহাদের এই সহৃদয় আতিথ্যের আড়ালে হিংস্র প্রলোভন মুখব্যাদান করিয়া নখর শানাইতেছিল। জুয়ার আড্ডা, বাজারের গাঁটকাটা এবং কারাগারের সাধারণ কয়েদীর সহিত ইহাদের কোনো প্রভেদ নাই। তাহারা শিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত সাজিয়া থাকে না, ইহাদের কৃত্রিম ভদ্রতা এবং সভ্যতার ছদ্মবেশ পরিয়া তাহারা বেড়ায় না। তাহারা স্পষ্ট উজ্জ্বল ও সহজবোধ্য সদ্ব্যবহারের ফাঁদ পাতিয়া বসিয়া নাই। সভ্যসমাজের চোখে এ বাড়ী আজ ধ্বংস হইল, ছোড়দির অকলঙ্ক জীবনের হইল অপঘাত মৃত্যু, তাহারা হইল চিরকালের জন্য লোকচক্ষে ঘৃণিত। বিজুর গলার ভিতরে কান্না উঠিয়া আসিল।

দেখিতে দেখিতে কানাঘুসায় বাড়ীর সকলের মধ্যে জানাজানি হইয়া গেল। ছোড়দির অলক্ষ্যে যখন একটা লজ্জাকর আন্দোলন নিতান্তই প্রবল হইয়া উঠিল, তখন আর তাঁহার জানিতেও বাকি রইল না। বিজুর একবার মনে হইল, বাড়ীর সকলকে আজ একবার প্রচণ্ডভাবে অপমান করিয়া নিজে তিনি আত্মহত্যা করিবেন। তবু সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

ছোড়দি ধীরে ধীরে তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বিজুর মাথার মধ্যে ঝিম্ ঝিম্ করিতে লাগিল। মনে হইল, ছোড়দির মুখখানা কঠিন, শীতল, ইস্পাতের মত তীক্ষ্ণ,—ধারালো অথচ

জীবনচিহ্নহীন। চোখে তাঁহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, মুখখানা রক্তহীন, বিকৃত ওষ্ঠাধরে মর্ম্মান্তিক শ্লেষ। জিজ্ঞাসা করিলেন, পেয়েছ স্যুট্‌কেস?

না ছোড়দি। বলিতেই বলিতেই বিজুর মুখের ভিতর হইতে এক টুক্‌রা আর্ত্তনাদ বাহির হইয়া আসিল। বলিল, সারা বাড়ী, সব ঘর, সমস্ত খুঁজলাম, কোথাও তার চিহ্ন নেই!—তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল।

তা-হলে বাদল যাবে কেমন করে?

যেতে সে পারে ছোড়দি, কিন্তু এ অপমান যে আমাদের সইবে না!—হঠাৎ চুরমার হইয়া বিজু তাঁহার পায়ের কাছে বসিয়া পড়িল।

অন্ধকারে ছোড়দি পলকের জন্য একবার নিঃশব্দে দাঁড়াইলেন, তারপর পা সরাইয়া চলিয়া যাইবার সময় একরূপ অস্বাভাবিক কণ্ঠে বলিয়া গেলেন, একে অপমান বোলো না বিজু, এ হচ্ছে অপমৃত্যু!

নীচে উপরে সমস্ত বাড়ীখানা স্তব্ধ ও মুহ্যমান হইয়াছিল। আগামী কাল প্রাতঃকাল হইতে যে কলঙ্ক ও লজ্জার স্রোত অবারিত হইতে থাকিবে, সারা নিঝুম বাড়ীখানা যেন অটল নীরবতায় তাহারই সাগ্রহ প্রতীক্ষায় রহিয়াছে। ছোড়দি ছাদের পাঁচিলে ভর দিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়াছিল। সে রাত্রি ঘোর কৃষ্ণ পক্ষের। আকাশে কোথাও আলো নাই, তারায় তারায় সারা অন্ধকার আকাশ ছাইয়া আছে। তিনি চলৎশক্তিহীন,—মনে হইল জীবনের আর তাঁহার চেতনা নাই, ইচ্ছা-অভিরুচি নাই, তিনি প্রস্তরীভূত, তিনি ক্লান্ত। মেরুদণ্ড আজ তাঁহার ভাঙিয়া গেল, এ আর কোনোদিন সোজা হইবে না। এ বাড়ীতে পাপ প্রবেশ করিল, সে পাপ এবার সকলকে বহিয়া বেড়াইতে হইবে। অসাড় দুইটি চক্ষু মেলিয়া ছোড়দি কোন্ দিকে যে তাকাইয়া রহিলেন তাহা বুঝা গেল না। শুধু তাঁহার মনে

হইতে লাগিল, এ অন্যায়ের জন্য তিনিই দায়ী, তিনিই। কাল হইতে মহাসমুদ্রের মত বিরাট জনসমাজ তাঁহার নিন্দায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতে থাকিবে। তাঁহার সম্ভ্রম যাইবে সম্মান যাইবে, লোকের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস হারাইতে হইবে, ভদ্রসমাজের জঞ্জালের মত তাঁহাকে দিন কাটাইতে হইবে। কানের ভিতর তাঁহার অগ্নিদাহের মত হু হু করিয়া শব্দ হইতে লাগিল।

ছোড়দি, আপনি এখানে?

ছোড়দি পিছন ফিরিয়া তাকাইলেন, বলিলেন, কে বাদল? চল ঘরে যাচ্ছি। তোমার যাওয়া ত তাহলে হলো না দেখ্‌ছি?

ছাদের কোলেই তাঁহার ঘর। ভিতরে ঢুকিয়া কহিলেন, তাইত, তোমার স্যুট্‌কেসটার কথাই ভাবছি ভাই। এ রকম কখনো হয় না! ভোজবাজীর মতন কোথায় যে···আশ্চর্য্য!

বাদল একটু হাসিল। বলিল, স্যুট্‌কেসটার জন্যে আমি ব্যস্ত নই, আমি ভাবছি মেজদিদির ওষুধটার কথা। শিলাজিত্‌ ত হিমালয় ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যায় না! ওটা যদি পেতাম!

ছোড়দি কহিলেন, তা-হলে তোমাকে থেকেই যেতে হ'লো ত?

না ছোড়দি, এ রাতে যাওয়া হ'লো না, ভোর রাতে আমায় চলে যেতেই হবে। ওষুধটা যদি না পাই তাহলে মেজদিদির সঙ্গে দেখা না করেই চলে যাবো। কারণ, যেতেই হবে!

তুমি ত ভারি একগুঁয়ে বাদল! যদি ঘুমিয়ে পড় তা হলে কেমন করে প্রতিজ্ঞা থাকবে?

প্রতিজ্ঞা নয় ছোড়দি, প্রয়োজন।

প্রয়োজন? এ ছাড়া সংসারে আর কোনো দাবি নেই? প্রয়োজনের জন্যেই আমাদের বাঁচা, আর কোনো প্রয়োজনে নয়? এখানে থাকতে বুঝি তোমার ভাল লাগে না বাদল?—ছোড়দি অস্থির হইয়া একটু হাসিলেন।

ঘরের দরজায় বাদল দাঁড়াইয়াছিল। মুখের উপর তাহার বিদ্যুতের আলো পড়িয়াছে। ছোড়দি ছিলেন খাটের বাজু ধরিয়া দাঁড়াইয়া। বাদল হাসিয়া কহিল, ওরে বাবা, আপনার এ মুখ কখনো দেখিনি ছোড়দি। আমার কিন্তু সত্যি যাওয়া দরকার। আপনি একটু বিবেচনা করুন না।

কি বল ?

বাদল একটু থামিল, তারপর ঢোক গিলিয়া হাসিয়া কহিল, বলছি ওই স্যুট্‌কেসটারই কথা, ওটা পেলেই আমি চলে যেতে পারি।

ছোড়দি তাহার মুখের দিকে তাকাইলেন। বাদল হাসিয়া উঠিয়া কহিল, আমি দেখ্‌তে পেয়েছিলাম ছোড়দি, আপনি যখন ওটা নিয়ে বেরিয়ে এলেন !

তার মানে বাদল ? আমি চোর ?—ছোড়দি প্রায় চীৎকার করিয়া উঠিলেন।

বাদল কহিল, আচ্ছা, আপনিই বলুন ত, সেকি আমার চোখের ভুল ?

ছোড়দি ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। কিন্তু কোথাও গেলেন না, আবার তখনই ফিরিয়া আসিলেন। গায়ের রক্তে রক্তে তাঁহার আগুন ধরিয়া গিয়াছে। ভিতরে খানিকক্ষণ ঘুরিয়া বেড়াইয়া এটা ওটা নাড়া চাড়া করিয়া চাবি খুলিয়া আল্‌মারির ভিতর হইতে তিনি স্যুট্‌কেসটি বাহির করিলেন। বলিলেন, এই নাও, আমিই চোর ! আর ত তোমার চলে যাবার বাধা নেই, এইবার বেরিয়ে পড় ? হ্যাঁ, খুলে দেখে নাও, টাকাকড়ি সব ঠিক আছে কিনা !

স্যুটকেসটি তুলিয়া লইয়া বাদল ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। নিজের ঘরে আসিয়া ঢুকিতেই পিছনে পিছনে ছোড়দি আবার আসিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, চুপ করে চলে যেও না বাদল, কোমরে

দড়ি বেঁধে টেনে নিয়ে যাবার কাজ করেছি, একটা যা হোক শাস্তি দিয়ে যাও। হ্যাঁ, এক্ষুণি তোমায় চলে যেতে হবে, আর এক মুহূর্ত্ত না। চল, তোমাকে বের করে দিয়ে সদর দরজা বন্ধ করে আসি। কেউ জেগে নেই! চল, আর এক মুহূর্ত্তও না!

বাদল বাহির হইয়া নীচে নামিতে লাগিল। পিছনে নামিতে নামিতে ছোড়দি কহিলেন, আমার সব চেয়ে দুঃখ····· সব চেয়ে আনন্দ যে একজন আজ আমাকে চোর বলে জেনে গেল। কী হয়ে বেঁচে আছি বল ত? ভাল হয়ে, সৎ হয়ে, সচ্চরিত্র হয়ে। এর কি দরকার, এসব কি হবে আমার বলতে পার?

নীচে নামিয়া বাদল সদর দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া গেল। একটি কথাও সে কহিল না। ছোড়দি গিয়া দরজাটা খুলিয়া দিলেন। বলিলেন, তুমি রইলে না, কিছুতেই রইলে না; সেই ভালো, আমাকে চোর, বলেই জেনে যাও,—চোর মিথ্যেবাদী, অধার্ম্মিক! কেমন করে তোমাদের বোঝাবো, উঁচু আসন আর আমার ভাল লাগে না,—সম্ভ্রান্ত, ভদ্র, লোকের শ্রদ্ধা পেয়ে বাঁচা ·····ক্লান্ত, আমি বড় ক্লান্ত বাদল।

দরজার চৌকাঠে পা দিয়া বাদল হেঁট হইয়া তাহার পায়ের ধূলা লইতে গেলে তিনি সরিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, না না না, ছুঁয়ো না, শুধু আমাকে ছুঁয়ো না, তখন আমার পা ছুঁয়েছিলে তুমি······জানো না পা ছুঁলে আমার কী হয়, কী যন্ত্রণায় আমার চোখ বুজে আসে······তুমি যাও বাদল, তুমি যাও সুমুখ থেকে। বলিয়া একরূপ তাহাকে বাহির করিয়া দিয়া তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন।

॥ সাত ॥

ঐশ্বর্য্যের নানা আড়ম্বর; তার প্রকাশের নানা ভঙ্গী। সুরার মতো তার প্রকৃতি, উচ্ছ্বসিত হয়ে পাত্রের সীমানাকে অতিক্রম করাই তার রীতি। নৈলে সামান্য গৃহপ্রবেশকে উপলক্ষ্য করে এমন অসামান্য সমারোহ উত্তর কলিকাতায় কে আর কবে দেখেছে? বিবাহ নয়, প্রীতিভোজ নয়, জন্মতিথি উৎসব নয়—কেবলমাত্র গৃহপ্রবেশ। চিরস্মরণীয় গৃহপ্রবেশ।

পথের জনতা বিস্ময়-বিমুগ্ধ, হতচকিত। সম্মুখে প্রস্তরময় সিংহ-মূর্ত্তিখচিত লাটভবনের প্রবেশ-পথের মতো বিশাল দরজা; তার পরেই লাল কাঁকরের অন্দরগামী পথের দু'ধারে পুষ্পলতার কেয়ারি করা বিস্তীর্ণ উদ্যান, এবং তারপরেই মার্বেল পাথরের পেটির উপর তাজমহলের মতো বিরাট অট্টালিকা। আলোকমালায় সুসজ্জিত সুবিপুল প্রাসাদ।

রাস্তার ধারে যে অসংখ্য মূল্যবান মোটরগুলি অপেক্ষা করছে তাদের থেকে সহজেই জানা যায় আজকের আসরে নগরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীগণের একত্র সমাবেশটি কেমন। স্যর গণেন্দ্রনাথের অবিসম্বাদী জনপ্রিয়তা সকলকে নির্বিচারে আকর্ষণ করে এনেছে।

সোপান বেয়ে উঠে এলেই বিস্তৃত কক্ষ, কক্ষের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্য্যন্ত ঢালা বেগুনী মখ্‌মলের বিছানা। তারই উপর যে নরনারীগুলি পরস্পর উচ্ছল কথালাপে মশ্‌গুল্, মনে হয় তাঁদের প্রত্যেকেই সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অবারিত আশীর্ব্বাদ চিরজীবন ধরে পেয়ে এসেছেন; অজস্রতা ও প্রাচুর্য্যের সহিত তাঁদের প্রতিদিনের অচ্ছেদ্য পরিচয়। আসরের মধ্যস্থলে গোলাপ-জলের ফোয়ারা, ভিতর থেকে

বৈজ্ঞানিক উপায়ে কেমন একটি বহুবর্ণ-আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে। দেয়ালের নীচে-নীচে কয়েকটি উজ্জ্বল পিতলের আধারে গুটিকয়েক সূর্যমুখী ও ক্রিসেন্‌থিমামের চারা বসানো—ফুল ফুটে রয়েছে। টুক্‌রো হাসি, মধুর সৌজন্য, ছোট ছোট পরিচয়ের আদান-প্রদান, চুড়ির আওয়াজ, সাড়ীর শব্দ,—প্রাণের চাঞ্চল্যে কক্ষটি মুখরিত। চটুল এক একটি রসালাপ মাঝে-মাঝে মুখ থেকে মুখে ঘোরাফেরা করছে।

গানের আসর বসেছে। লক্ষ্ণৌ থেকে এসেছেন বিখ্যাত ঠুংরী-গায়ক সুদর্শন মিশ্র। আর কলকাতার যাঁরা বহু-পরিচিত গায়ক-গায়িকা, তাঁদের প্রায় সকলকেই দেখা যাচ্ছে। রেকর্ড আর রেডিওতে গান গেয়ে জনসাধারণকে যাঁরা সম্মোহিত করেছেন, পুলকিত ও মুগ্ধ করেছেন,—তাঁদের সকলকে একত্রে পাওয়া স্যর গণেন্দ্রনাথের পক্ষে কঠিন হয়নি। কলিকাতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ফুলগুলি আজ থরে থরে সাজানো।

এদিকে গানের আসর ওদিকে আদরেও আপ্যায়ন। অমুক ষ্টেটের রাজকুমারী এসে পৌছলেন, তাঁকে সাদর অভ্যর্থনা করে এনে বসানো হলো; বিনয়-নম্রতায় অবনতমুখী মেয়েটির সর্ব্বাঙ্গ দিয়ে ঐশ্বর্য্যের গৌরব বিকীর্ণ হচ্ছে। অমুক জষ্টিসের বাড়ীর মেয়েরা বসেছেন আলোর ঠিক নীচেই; একটি মেয়ের কানের দুটি দুল বর্ষা-মেঘের বিদ্যুৎলতার মতো এক একবার ঝল্‌সে উঠ্‌ছে। গৃহস্বামিনী এসে মাঝে-মাঝে অতি-ভদ্রতায় একজনের সঙ্গে আর একজনের পরিচয় করিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। রাধানগরের অমুক জমিদার সস্ত্রীক এসে প্রবেশ করলেন, তাঁকে অভ্যর্থনা করার কি ব্যাকুলতা,—বয়সে তিনি এখনো তরুণ; তাঁর গায়ে-জড়ানো উড়ানীর সাচ্চা-জরির প্রান্তটা কোষমুক্ত তলোয়ারের ফলকের মতো ঝল্‌মল্‌ করছে। স্ত্রীর চোখে শ্বেত-পাথরের মোটা চশমা, বাঁ-হাতের চুড়ির সঙ্গে একটি

বহুমূল্য রিষ্ট্‌ওয়াচ, মুখে তাঁর সুকৌশল টয়লেটের চাকচিক্য। দীপ্তশ্রী যৌবনের জটলা; কোথাও একান্তভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় না, সুসজ্জিত প্রদর্শনীর মতো চোখ বুলিয়েই চলা যায়।

'আপনিই ডক্টর সেন?—আই সী। কাউন্সিলে আপনার বক্তৃতাটা নিয়ে খুব হৈ চৈ হয়েছে কাগজে দেখ্‌লুম। 'Twas delivered very passionately.'

ডক্টর সেন সবিনয়ে একটুখানি হাসলেন।

একটি যুবক অতি মৃদুকণ্ঠে আলাপ করছেন এক তরুণীর সঙ্গে,—তাঁদের চারিটি চক্ষু মুখের চেয়েও মুখর,—সম্ভবত অনেকদিন পরে দেখা, প্রভাত-সূর্য্যের মতো ক্ষণে ক্ষণে জ্যোতির্ম্ময় হয়ে উঠ্‌ছে তাঁদের মুখ। আসরের মাঝখানে না হলে তাঁরা হয়ত আরো নিকটতর হয়ে কথা বলতেন।

'শুনলুম নাকি ছবি আঁক্‌চেন আজকাল? আমাকে খানকয়েক যদি দেন, বম্বের আর্ট একজিবিশনে পাঠিয়ে দিতে পারি।'

তরুণীটি লজ্জায় রক্তাভ হয়ে বল্‌লেন, 'ছবি এমন কিছু হয় না, আপনি যদি একদিন আমাদের ওখানে যান তাহলে—'

'থ্যাঙ্কস্‌, যাবো একদিন।'

এমন সময় গণেন্দ্রনাথ এসে ঢুকলেন একটি মেয়ের কাঁধের উপর হাতের ভর দিয়ে। মেয়েটির বয়স বছর আঠারো, পরণে সাড়ী নয়, হাঁটু পর্য্যন্ত মস্‌লিনের একটি ফ্রক্‌ গলা থেকে নেমে এসেছে, সুডোল দু'খানি পা শাদা রেশমি মোজায় ঢাকা। মাথার চুল বব্‌ করা। গণেন্দ্রনাথ অনেকের সঙ্গেই তার পরিচয় করিয়ে দিলেন, মেয়েটি হেসে-হেসে নমস্কার বিনিময় করতে লাগ্‌লো। নিজের শরীর সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সচেতন নয় দেখে অনেকেই বোধ করি একটু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। নাম তার নমিতা। ফ্রকের উপরে গলা থেকে কোমর পর্য্যন্ত একটি বেণীপাকানো কালো চামড়ার চাবুক ঝোলানো,—শোনা

গেল, নমিতার ঘোড়ায় চড়ার কৃতিত্ব দেখে কোন্ এক মাড়োয়ারী লক্ষপতি তাকে একটি সোনার তরবারি উপহার পাঠিয়েছিলেন। পা মুড়ে হাঁটুর উপর চেপে নমিতা বসে পড়লো, ফ্রক্‌টা একটু টেনে দিল।

সুদর্শন মিশ্র গান সুর করলেন। খান্‌সামা রূপার ট্রে-তে করে সুস্বাদু সরবৎ বিলি করছিল, মাঝে-মাঝে আসছে সিগারেটের থালা, বর্ম্মা চুরুটের বাণ্ডিল। স্ক্রীণের ফাঁকে পাশের কক্ষে ডিনারের টেব্‌ল্ সাজানো হচ্ছে, কাঁচের প্লেট্ ও চামচের আওয়াজ আস্‌ছে। এক একবার কাঁচের গ্লাস ভাঙার মতো উৎক্ষিপ্ত হাসির শব্দ উঠেই আবার থেমে যাচ্ছে,—মেয়েদের হাসির শব্দই আলাদা। মিশ্রজীর গান আরম্ভ হবার পর সকলের মনোযোগ সেইদিকে আকৃষ্ট হলো। বাস্তবিক, গান তিনি ভালই গান।

প্রধানত গানেরই আসর বলা যেতে পারে ; কারণ, একজনের পর একজন গান গেয়েই যেতে লাগলেন, থামবার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না।

'কই হে, সুনীল কই, এসো এসো,—ধরো হারমোনিয়ম্'—ভিড়ের মধ্যে এতক্ষণ বসেছিল সুনীল, কুণ্ঠিতকণ্ঠে বল্‌লে, 'আমার যে ভাঙা গলা প্রতুলদা'—

'ওতেই হবে, আমরা কিছু মনে করবো না,—এসো—কি হে, একে চেনো ত,—সুনীল চৌধুরী ! চেনো না তোমরা সুনীল চৌধুরীকে ? ওয়ান্ডার ! সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা কথাটার মানে জানো ত ? সুনীল হচ্ছে তাই, ভারসাটাইল্ যিনিয়স্। গাও সুনীল, তোমার সেই বাগেশ্রীর আলাপটা ধরো।'

সুনীল অত্যন্ত বিব্রত হয়ে সরে এলো। প্রতিবাদও খাট্‌বে না, অক্ষমতার ক্ষমাও মিল্‌বে না।

'আজ মনে পড়ছে সেই সুনীল চৌধুরীকে, ঘিয়ের দোকান করে যে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে বসে থাকতো ; আশ্চর্য্য হয়ো না তোমরা,—তারপর দিল চপ্-কাট্‌লেটের হোটেল,—তারপর কি সুনীল ?'

আসরের সবাই উৎকর্ণ হয়ে এদিকে তাকালো। সুনীল বল্‌লে, 'তারপরেই ত গেলাম চাষ করতে।'

'মার্ভেল্যাস্—আরে, এই যে মনোরমা এসেছ। আচ্ছা, আগে হোক মনোরমার গান, তারপর সুনীল,—সুনীল দেবে ফিনিশিং টাচ্‌। মিশিরজি, আপ্‌ ঠেকা দেয়েঙ্গে?'

'মেহেরবাণী।' বলে মিশ্রজি বাঁয়া-তবলাটা টেনে নিলেন।

মনোরমার গান হয়ে যাবার পর প্রতুলবাবু আবার সুনীলকে ধরে বসলেন। সুনীল বল্‌লে, 'গত জন্মের শত্রুতার প্রতিশোধ এ-জন্মে নিচ্ছেন প্রতুলদা?'

'কেন, কেন?'

'আজ আমাকে জবাই না করে ছাড়বেন না দেখ্‌ছি।'

'লজ্জা হচ্ছে গাইতে? শুনুন সমবেত ভদ্রমহোদয় ও ভদ্রমহিলাগণ, সুনীল চৌধুরীর লজ্জা!—কি হে, তোমার সেই দুর্দ্ধর্ষ চেহারাটা গেল কোথায়? কোথায় গেল তোমার যৌবনের সেই বেপরোয়া এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট্‌গুলো? বাঙালীর ছেলেদের শক্তির বয়েসটা বড় ক্ষণস্থায়ী। সুনীল, আজো তোমার সেই আজগুবি য়্যাম্‌-বিশ্যন্‌গুলোর ফর্দ্দটা মনে পড়ছে হে, তোমার মতো ইন্‌ট্যরেষ্টিং লাইফ্‌ আমি দেখিনি!'

মেয়েরা ওদিকে সকৌতূহলে মুখ চাওয়াচায়ি করছিলেন। অথচ যাকে নিয়ে আলোচনা, সে-ব্যক্তিটি নিতান্ত নির্ব্বিকার হয়ে সব শুনে চলেছে, চোখে মুখে তার আত্মপ্রসাদের চিহ্নমাত্র নেই! একটি ভদ্রমহিলা বোধ করি মনে-মনে উত্ত্যক্ত হয়ে এবার জানালেন, 'ভূমিকা ত অনেক হলো, এবার গান হোক প্রতুলবাবু?'

'হবে, দাঁড়ান্‌'—প্রতুলবাবু বল্‌লেন, 'ভূমিকার পর উপক্রমণিকা।'

অনেকেই একটু শোভন হাসি হাসলেন। মিষ্টার রায় বল্‌লেন, 'আপনার গৌরচন্দ্রিকার জন্য ধন্যবাদ।'

অতিথি এবং অভ্যাগতর সংখ্যায় চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গণেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী এসে এইবার সকলের সহিত যোগদান করলেন। বহু নরনারীর সমাগমে যে বিশৃঙ্খলাটুকু দেখা যাচ্ছে তাকে ঠিক জনসাধারণের হট্টগোল বলা চলে না, সেটুকু সুশোভন ও সুরুচিপূর্ণ, তার মাত্রার সীমা আছে। দুই তটের মধ্যে কোনো কোনো নদীর প্রবাহকেও একটু উচ্ছৃঙ্খল হতে দেখা যায়।

হারমোনিয়মটা টেনে নিয়ে সুশীল বাজাতে সুরু করলো। প্রথমেই ধরলো বাগেশ্রী। জনতা স্তব্ধ। ওধারে মেয়েদের কানাকানি কথালাপ বন্ধ হলো। নমিতার মুখে-চোখে আর চাঞ্চল্য নেই। জষ্টিসের বাড়ীর মেয়েরা অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। বাইরের পরদার ফাঁকে খানসামাটা পর্য্যন্ত উঁকি মারছে। প্রতুলবাবুর মুখে আর কথা নেই। মিশ্রজী তবলা বাজিয়ে চলেছেন। বর্ষার সজল রাত্রি ছাপিয়ে বাগেশ্রীর সকরুণ রাগিণী যখন আহত পক্ষীশাবকের মতো দেয়ালে-দেয়ালে প্রতিহত হয়ে বেড়ায় তখন তার বর্ণনা নেই। সঙ্গীতের সাধনা সুনীল করেছে বটে। নীরব প্রশংসায় সবাই তাকে অভিনন্দিত করলেন।

গান থামলো। বৈদ্যুতিক পাখার কিচ্ কিচ্ শব্দ ছাড়া ভিতরে আর কিছু শোনা যাচ্ছে না। এমন সময় প্রতুলবাবু নবাগতা এক তরুণীকে দেখে সচকিত হয়ে উঠলেন।

'আরে, বনলতা কতক্ষণ? তুমি ত আজকের হীরোয়িন্,—এসো, এসো; সবাই আজ অপেক্ষা করে রয়েছেন তোমার গানের জন্যে,— আমি ত প্রায় তোমার আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম।'—বলে প্রতুলবাবু সুনীলের সঙ্গে বনলতার পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এই সর্ব্বজনপ্রিয়া সঙ্গীত-রাণীর দিকে তাকিয়ে আসরে একটি আনন্দ-গুঞ্জন উঠ্লো।

বনলতা বল্লেন, 'আপনার কথা শুনেচি আমি প্রতুলদার কাছে।'

কী বিনীত এবং লাবণ্যবতী মেয়ে! রাজকন্যার মতো যেন গৌরব-গর্ব্বিতা! প্রথমটা সুনীলের মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। ভিতরটা তার অস্থির আনন্দে ক্ষণে ক্ষণে উদ্বেল হয়ে উঠ্ছিল। এই সুবিখ্যাত বনলতা? যার কণ্ঠসঙ্গীত বাংলাদেশে এনেছে যুগান্তর? রাত্রির পর রাত্রি সুনীল যাকে স্বপ্নে দেখেছে? পথে, ঘাটে, লোকের মুখে, বহু গানের আসরে, রেডিয়ো ও রেকর্ডে, দেশে-বিদেশে যার সর্ব্বজনসম্মত খ্যাতি—এই সেই বনলতা দেবী? গালে একটি ছোট কালো তিল, চোখে চশমা, সিঁথিতে সিঁদূরের আভাস, পরিচ্ছন্ন দাঁত, আলুথালু দেহভঙ্গী,—অপলক চোখে সুনীল তাকালো। প্রাণের সমস্ত আনন্দ তার চোখের দৃষ্টির উপরে থর থর ক'রে কাঁপ্‌চে। আজ তার জীবনের একটি স্মরণীয় দিন।

কথা বলতে গিয়ে তার গলা অস্বাভাবিক রকম কেঁপে উঠ্‌লো; আজ যদি তার দুর্ব্বলতা একটু প্রকাশ পায় তবে এই শিক্ষিত ও সুসভ্য সম্প্রদায় তাকে যেন মার্জ্জনা করে। ধীরে ধীরে বল্‌লে, 'আপনার কীর্ত্তনের আমি বিশেষ অনুরাগী।'

বনলতা সলজ্জ একটু হাসলো। অগণিত নরনারীর প্রশংসা সে শুনেছে, সুনীলের অনুরাগে তার কী আসে-যায়? সকল প্রশংসার অতীত সে, শ্রদ্ধা ও সম্মান লুটোচ্ছে তার পদপ্রান্তে কাঙালের মতো, যশ ও খ্যাতি তার ক্রীতদাস।

হেসে বনলতা বল্‌লেন, 'আপনার গানও শুনেচি খুব ভাল, যদিও এখনো শোনবার সৌভাগ্য হয়নি।'

আবার সুনীলের কণ্ঠরোধ হয়ে এল। তার গানের কথা শুনেছেন বনলতা? অখ্যাত কোন্ এক নগণ্য মানুষ সে, তার উপরেও পড়েছে সূর্য্যের কিরণ? তার ইচ্ছা হলো আনন্দে চীৎকার করতে, উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠ্‌তে। সে কি এবার নৃত্য করবে? উঠে দাঁড়িয়ে বিদীর্ণকণ্ঠে সকলকে শুনিয়ে দেবে তার এই উল্লাস? মনে হচ্ছে, তার শরীরের

প্রত্যেকটি রোমকূপ পর্য্যন্ত হর্ষে ও পুলকে ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চ হয়ে উঠ্‌ছে।

অনেকে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠ্‌লেন বনলতার গানের জন্য। আর কারু সবুর সইছে না। বনলতার জন্য ব্যাকুল তারা নয়, তার গানের জন্য। অকৃতজ্ঞ জনসাধারণ! সুনীলের ইচ্ছা হলো, তাঁকে মানা ক'রে দেয় গান গাইতে। কতটুকু বোঝে ওরা বনলতাকে? শিল্পীকে কতটুকু সম্মান দিতে জানে জনসাধারণ?

লোকের আগ্রহ বেড়েই চলেছে। প্রতুলবাবু বল্‌লেন, 'তোমার ভৈরবীটা ধরবে নাকি?'

বনলতা বল্‌লেন, 'বাবারে বাবা, নেমন্তন্নে এলুম এখানেও গান গাইতে হবে প্রতুলদা? শরীরটা যে আজ ভাল নেই। তা ছাড়া আমায় যেতে হবে এখুনি।'

'কোথায়?'

'আর একটা নেমন্তন্ন আছে বালীগঞ্জে।'

'তবে একটা কীর্ত্তন গেয়েই যাও; তোমার সেই ভৈরবীটা—।' বলে প্রতুলবাবু হারমোনিয়ম্‌টা তাঁর দিকে ঠেলে দিলেন।

আজকের এই জাগ্রত স্বপ্নময় রাত্রি সুনীলের যেন আর না পোহায়। প্রস্তর মূর্ত্তির মতো সে বসে রইলো অপলক চোখে। কীর্ত্তন যে এমন করে গাওয়া যায়, তার আবেদন হৃদয়কে যে এমন করে দ্রবীভূত করে—এ সুনীলের জানা ছিল না। শ্রোতার দল মূঢ়, নিমেষ-নিহত, বিভ্রান্ত। সবাই শুন্‌ছিল গান, সুনীল তাকিয়ে ছিল তাঁর কণ্ঠের দিকে, মুখের দিকে, তাঁর সুকোমল অঙ্গুলি চালনার দিকে। তাঁর দেহমুক্ত আত্মা যেন অনন্ত আকাশের অকূল ও অতল আলোকের প্লাবনের মধ্যে পথহারা হয়ে বিচরণ করছে। ধন্য সে, কৃতার্থ সে! দেবীর দর্শন পেয়ে পূজারীর তপস্যা সার্থক হয়েছে।

কীর্ত্তন-গান শেষ করে মধুর হাসি হেসে সকলকে বিনীত নমস্কার

জানিয়ে বনলতা উঠে যখন বেরিয়ে চলে গেল, মনে হলো, কক্ষের সমস্ত প্রদীপগুলি নিবে গেছে, তারপর আসরে থাকার আর কোনো প্রয়োজন রইলো না; সুনীল এক ফাঁকে উঠে বাইরে এল। তখন বেশ রাত হয়েছে। লাল কাঁকরের পথ পার হয়ে সে সোজা পথে এসে নামলো। এবার তার নিতান্ত একাকী হওয়ার প্রয়োজন, নিঃসঙ্গ হয়ে সে সমস্তটাকে একবার অনুভব ক'রে নেবে। মাথার উপরে বর্ষার আকাশে মেঘ করেছে, একটিও তারা দেখা যাচ্ছে না। পথের অনুজ্জ্বল আলোগুলি অতিকষ্টে দাঁড়িয়ে যেন আপন কর্ত্তব্য পালন করছে। সম্মুখের এই আলোকমালার অত্যুগ্রতাকে বর্জ্জন ক'রে সে কিছুদূর এগিয়ে গেল, এবার তার ভাল লাগছে অন্ধকার, কোমল নিবিড় অন্ধকার। পথের ধারে চারিদিকে তাকিয়ে একবার সে দাঁড়ালো, সব যে তার চোখে নূতন ঠেক্ছে, কিছুই সে চিন্তে পারছে না,—পথগুলো যেন তালগোল পাকিয়ে জড়াজড়ি ক'রে একাকার হয়ে রয়েছে। ইহলোক থেকে সে বিদায় নিয়েছিল, ফিরে এসে কিছুই আর পরিচিত মনে হচ্ছে না। আবার অনেকদূর হাঁট্তে হাঁট্তে সে চল্লো, হাঁট্তে তার ভাল লাগছে আজ, তার একান্ত একাকিত্বকে ঘিরে আজ যেন গ্রহে-গ্রহে, তারায়-তারায়, সমগ্র সৌর-সভায় চল্ছে আনন্দ কলরব, বিচিত্র উৎসব।

এক সময় সে গাড়ীতে চড়ে বসলো। স্বপ্নের ঘোরে কতক্ষণ তার পার হয়ে গেছে, এবার সে বেশ সজাগ হয়ে শক্ত হয়ে বসলো। গাড়ী যখন দ্রুত চল্‌চে তখন তার চোখের উপর দিয়ে ঘর-বাড়ী, দোকান-বাজার, সিনেমা-পার্ক, সমস্তগুলিই আপন আপন সাজ-সজ্জার উপরে একটুখানি স্বপ্নের রং মেখে একটি অবাস্তব পরিচয় দিয়ে ছায়াচিত্রের মতো সরে যেতে লাগ্‌লো। অনেকক্ষণ এমনি ভাবে চলবার পর সে হঠাৎ চকিত হয়ে দেখ্‌লো, পথ ভুল হয়েছে। তাড়াতাড়ি গাড়ী থামিয়ে সে নেমে পড়্‌লো। ছি ছি, আজ তার হয়েছে

কি? তার এই সুলভ আত্মবিস্মৃতির নভেলিয়ানা অন্তত আজকের রাত্রে মানায় না!

হেঁটে হেঁটে প্রায় রাত্রি বারোটা নাগাৎ সে অন্ধকারে বাড়ীর দরজার কাছে এসে পৌঁছলো। সহরের একপ্রান্তে একদিকটা সন্ধ্যার পরেই নিশুতি হয়ে যায়। আন্দাজে দরজায় হাত বুলিয়ে সে কড়া নাড়লো। কিয়ৎক্ষণ পরে দরজা খুলে যেতেই সে দেখ্‌লো, কেরোসিনের ডিবে হাতে স্ত্রী এসে ঘুমচোখে দাঁড়িয়ে।

'অসুখ-বিসুখের ঘর, এত রাত অবধি বাইরে থাকলে কি চলে?'

সেই পরিচিত বিরক্তিকর কণ্ঠস্বর! একটি সুরের তার ছিঁড়ে যেন ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল। উত্তর দেবার প্রবৃত্তি তার হলো না, কিন্তু দু'পা গিয়ে সিঁড়ির ধাপে পা দিয়ে সে অস্বাভাবিক তিক্তকণ্ঠে বল্‌লে, 'গায়ে কি তোমার একটা ছেঁড়া জামাও জোটে না?'

আর সে দাঁড়ালো না, হন্ হন্ করে উপরতলায় উঠে গেল। ঘরে ঢুকে সে আলোটার কাছে এসে একবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো। পুরোনো আলোটার চিম্‌নীতে ভুসো লেগে কদর্য্য হয়ে উঠেছে, তবু সেই স্তিমিত আলোয় সে দেখলো, পরনের জামা-কাপড়গুলি তার নিতান্তই ময়লা, এইগুলিই সে জড়িয়ে রয়েছে সন্ধ্যা থেকে।

নিতান্ত সাধারণ স্ত্রী, অসুস্থ পুত্রকন্যা, দরিদ্র গৃহসজ্জা, বায়ুলেশহীন ক্ষুদ্র ঘর,—আজ সকাল পর্য্যন্ত এদের নিয়ে সে খুসিই ছিল, কিন্তু আজকের রাত্রে সত্যি এসব আর কিছু ভাল লাগছে না, কে যেন সবলে তার টুঁটি টিপে ধরেছে, একটি কঠিন অসন্তোষ রি রি করে জ্বল্‌ছে তার সর্ব্বাঙ্গে। জীবনে বারে বারে মাথা তুল্‌তে গিয়ে বারে বারে কেন ঘটেছে তার পরাজয়—আজকের বিনিদ্র রাত্রে বসে-বসে এই কথাটাই সে একবার নাড়াচাড়া ক'রে দেখ্‌বে।

হয়ত এমনিই হয়। মানুষের জীবনে মাঝে-মাঝে আসে দুর্বোধ্য

মুহূর্ত্ত, তখন বোঝা যায় না কোথা দিয়ে গেল বুক ভেঙে, কোথা দিয়ে প্রবেশ করলে নির্মাস্ত অতৃপ্তি!

ভয়ত্রস্তা স্ত্রী একসময়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়েছে, সে দিকে লক্ষ্যও করলে না,--কেবল অনেকক্ষণ পরে আলোটা নিবিয়ে সে নিঃশব্দে জানলার ধারে বসে রইলো। দিক্‌দিগন্ত তখন মেঘাবৃত, অমা-রজনীর মতো কালীমাখা অন্ধকার, টিপ্‌ টিপ্‌ করে বৃষ্টি পড়ছে!

সমাপ্ত